কথিত নারীবাদের ইতিহাস, বিভ্রান্তি ও মিথ্যাচার

ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা

বব লুইস

ভাষান্তর : ফারিহা মায়মুনা

কথিত নারীবাদের ইতিহাস, বিভ্রান্তি ও মিথ্যাচার

ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা

বব লুইস

ভাষান্তর : ফারিহা মায়মুনা

সূচিপত্র

ভূমিকা	৯
ফেমিনিজমের কূটকৌশল	১১
ফেমিনিস্টদের উপেক্ষিত ইতিহাস	১৯
পিতৃতন্ত্র	৩৭
মজুরি পার্থক্যজনিত মিথ্যাচার	৫৫
ধর্ষণ জালিয়াতির মহামারি	৬০
পারিবারিক সহিংসতার মিথ্যাচার	৭৭
নারীর বিশেষ সুবিধা	৯৩
নারীবাদ নারীদের জন্যই ক্ষতিকর	১০৬
নারীবাদের প্রতিক্রিয়া	১১৬
সমাধান	১২৫

ভূমিকা

'তথ্য না থাকলে আপনি আর দশজনের মতোই একজন মতামতসর্বস্ব মানুষ মাত্র।'—উইলিয়াম এডওয়ার্ড ডেমিং

যে বইটি আপনি হাতে ধরে আছেন, জোর দিয়ে বলতে পারি—এই ধরনের বই এটিই প্রথম। এটা সত্য যে, নারীবাদের সমালোচনা বহু লোকই করে থাকেন। কিন্তু যে মাত্রায় তা হওয়া উচিত, এ প্রসঙ্গে সে মাত্রার বইয়ের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। আমার জানামতে নারীবাদ পরিবার, সম্প্রদায়; বিশেষত পশ্চিমা সমাজের যে অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করছে, সে অনুপাতে একে কখনোই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়নি। কীভাবে এটি পুরুষের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন এবং নারীদের অধঃপতিত করছে, সেই নির্মম বাস্তবতা আর কোনো বইয়ে এতটা নিখুঁতভাবে উঠে আসেনি।

সেই সব অত্যুগ্র চরম সত্যকে যথাসাধ্য সহনীয় রাখতে আমি অপেক্ষাকৃত হালকা ও বিদ্রুপাত্মক ভাষায় বইটি লিখেছি। এই বইটি নারীবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে সংঘটিত ট্র্যাজেডি, আত্মহত্যা ও খুনের সত্য ঘটনায় ভরপুর। এটি কেবল পুরুষদের বিরুদ্ধে নারীবাদের বৈষম্যের ধারাবিবরণই নয়; বরং একই সঙ্গে একটি গবেষণালব্ধ পিয়ার রিভিউড গ্রন্থও বটে। সাথে যুক্ত হয়েছে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার রীতিপদ্ধতি; যেখানে প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে—আদতে কখনোই সমতার কথা বলেনি নারীবাদ। বরং প্রকৃত বাস্তব এই যে, শুধু পুরুষরাই নারীবাদের শিকার নয়—শিশু, পরিবার, সমাজ এমনকি নারী নিজেও এই উগ্র মতবাদের ভুক্তভোগী।

বইটি লেখার সময় গবেষণা আর লেখালিখি বাদ দিয়ে আমাকে অশ্রুসংবরণ করতে হয়েছে বহুবার। আপনারাও একই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এর প্রতিটি অধ্যায়ই আলাদা আলাদাভাবে পড়া যেতে পারে, তবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা পড়ে গেলেই আপনি সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ হবেন। পুরোপুরি অজ্ঞ, অর্ধজ্ঞানী কিংবা ঝানু যা-ই হোন না কেন, এটি আপনাকে নারীবাদের সমূহ বিপদ সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন করবে, জ্ঞানের পরিধিকে করে তুলবে অধিকতর বিস্তৃত।

বইটি আপনি উপভোগ করলে, এর থেকে অন্তত কিছুটা হলেও শিখতে পারলে আশা করব—সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, মুখোমুখি সাক্ষাৎ কিংবা অনলাইনে রিভিউ লিখে বাকিদের অবগত করবেন। লেখক হিসেবে সেটি হবে আমার জন্য অকৃত্রিম আনন্দের। বইটি আপন করে নেওয়ার জন্য পাঠকদের প্রতি অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা।

ফেমিনিজমের কূটকৌশল

নারীবাদের মিথ্যাচার এবং ভণ্ডামি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় নাহয় খানিক বাদেই গেলাম; তার আগে আসুন দেখে নেওয়া যাক—যেকোনো মতাদর্শ বিস্তারে প্রোপাগান্ডা কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে; চাই তা হোক নারীবাদ, শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদ কিংবা অন্য কোনো আন্দোলন। প্রোপাগান্ডা কী? এই প্রশ্নে আমি *মেরিয়াম ওয়েবস্টার* প্রণীত সংজ্ঞাটিই উল্লেখ করতে চাই। অভিধানটি বলছে—

> 'প্রোপাগান্ডা হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপকার, ক্ষতি কিংবা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কোনো ধারণা, তথ্য বা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া অথবা এ জাতীয় প্রভাব ফেলতে সক্ষম যেকোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা।'

অক্সফোর্ড অনলাইন অভিধানে প্রোপাগান্ডার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে—

> 'কোনো তথ্য, বিশেষত পক্ষপাতদুষ্ট বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য, যা কোনো রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি বা মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়।'

ইতিহাসের পুরোটা সময়জুড়ে জনসম্মুখে আলোচিত হয়েছে, এমন প্রায় প্রতিটি ইস্যুই প্রোপাগান্ডার আওতাভুক্ত। সত্যি বলতে, উপরিউক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী এই বইটিও তেমনই একধরনের প্রচারণা। তবে আমি একে ব্যবহার করেছি প্রকৃত ঘটনা ছড়িয়ে দিতে। নারীবাদী আদর্শের মিথ্যাচারকে ছুড়ে ফেলতে এবং একই সঙ্গে ভণ্ডামিতে ঠাসা ফেমিনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সহযোদ্ধাদের তথ্য সরবরাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের লক্ষ্যে।

ফেমিনিজমের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন (Gynocentrism) বলতে যে বিষয়টা আছে, তা বাদ দিয়ে নারীবাদ সম্পর্কে যেকোনো আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। *মেরিয়াম ওয়েবস্টার*-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী Gynocentrism হচ্ছে—

> 'নারীসুলভ আগ্রহ বা নারীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দেওয়া বা এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া।'

এ প্রসঙ্গে *আরবান ডিকশনারি* বলছে—

> 'নারীকে সর্বদা অগ্রাধিকার দেওয়া, এমনকি অন্যের ক্ষতিসাধন করে হলেও। প্রায়শই যার ফলাফল হলো নারীর আধিপত্য।'

সবশেষে পুরুষবিদ্বেষের (Misandry) সংজ্ঞাটাও জেনে নেওয়া প্রয়োজন। নারীকেন্দ্রিকতার মতো এটিও ফেমিনিজমের অবিচ্ছেদ্য অংশ; বরং বলা ভালো এটি ছাড়া ফেমিনিজমের টিকে থাকাই দায়। *মেরিয়াম ওয়েবস্টার*-এর সহজ সংজ্ঞায় একে বলা হয়েছে—'পুরুষদের প্রতি ঘৃণা।' এসব সংজ্ঞাপর্ব শেষে এখন আমরা ফেমিনিজমের তৈরি ঘৃণা ও বিদ্বেষের গহ্বর তালাশে পুরোদস্তুর প্রস্তুত।

প্রাথমিক অবস্থায় নারীবাদের সূচনা হয়েছিল বিবাহ ও পারিবারিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের হাত ধরে। শুরুর দিকে নারীবাদীরা বিশ্বাস করত, বিয়ের পর একজন মেয়ের পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাদের অনেকে বিবাহকে চিহ্নিত করত দাসত্বেরই ভিন্ন একটি রূপ হিসেবে। শুধু তা-ই নয়, নিজ মতের সমর্থনে তারা যুক্তি দেখাত—সমাজ পুরুষদের যে অধিকার দিয়েছে, তার বেশির ভাগ থেকেই বঞ্চিত হয়েছে নারীরা। সাদা চোখে তাদের অভিযোগ ন্যায়সংগত বলেই মনে হয়, কিন্তু ভেতরের কথা মুদ্রার অপর পিঠের মতোই সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রথম দিককার নারীবাদীদের এই দাবি সত্য যে, পুরুষদের মতো অধিকার নারীদের কখনোই ছিল না। কিন্তু মুদ্রার উলটো পিঠটা তারা কখনোই বলে না। নারীদের যে পুরুষ সঙ্গীর এত এত দায়দায়িত্বও ছিল না, সে কথা বেমালুম চেপে যায় তারা। অথচ নারীবাদীরা এমন একটি বিষয় লুকোনোর চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত, হাজার বছর ধরে যা সর্বজনবিদিত। অধিকার ও প্রাপ্য নির্ভর করে কে কতটুকু দায় সামলাতে পারে—তার ওপর। সহজভাবে বলতে গেলে—একজন মানুষ যত বেশি দায়িত্ব পালন করবে, তত বেশি অধিকার তার প্রাপ্য।

যুদ্ধের সময় নারীদের জন্মভূমি রক্ষা করার প্রয়োজন হয়নি। একটা সময় পর্যন্ত তাদের অর্থনৈতিক দায়ভার পুরোটাই বহন করত স্বামীরা। সন্তান জন্মদান, লালন-পালন এবং পরিবারের সুব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ছাড়া আবহমানকাল

ধরে প্রায় তেমন কিছুই করতে হয়নি নারীদের। এসবের বাইরে সবকিছু প্রধানত স্বামীকেই সামলাতে হতো। বর্তমানে নারীবাদী আদর্শে যদিও সামান্য পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু মোটাদাগে এখনও এই আন্দোলন বিয়ে ও পারিবারিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত বিরোধী। এখনও তারা দায়িত্ব-কর্তব্যমুক্ত অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তির অলীক খোয়াবে বিভোর! এজন্য দেশে দেশে লড়াই, সংগ্রাম, আন্দোলনে রাজপথ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তারা। ফেমিনিজমের বিভিন্ন উপদল (Subset) এবং ধাপ (wave) রয়েছে। তবে এই বইয়ে আমরা সেসবের দুটি নিয়েই কথা বলব—

- যথেচ্ছা নারীবাদ (Choice Feminism)
- অন্তর্বিভাগীয় নারীবাদ (Intersectional Feminism)

আমার আলোচনা এই দুই বিষয়ে সীমাবদ্ধ করার কারণ হলো—নারীবাদের অন্যান্য সব দল-উপদলও কোনো না কোনোভাবে এই দুই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যথেচ্ছা নারীবাদকে কখনো কখনো ব্যক্তিগত নারীবাদও বলা হয়। সাধারণ ভাষায়—ভালোমন্দ তোয়াক্কা না করে নারীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্বারোপই এর মূল কথা। এ দলটি বিশ্বাস করে—যেহেতু একজন নারী সম্পূর্ণ মুক্ত, তাই ব্যক্তিগতভাবে সে যা ইচ্ছে তা-ই করার এখতিয়ার রাখে। নারীবাদের এই ধারা একজন নারীর সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক স্বাধীন পছন্দকে সমর্থন করে। এই মতাদর্শের অধীনে একজন ফুলটাইম কর্মজীবী নারী যতটুকু গ্রহণযোগ্য, ঠিক ততটুকুই গ্রহণযোগ্য একজন যৌনকর্মী বা অবিবাহিতা মা! নারীবাদের বিখ্যাত তারকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের ফেমিনিস্টদের কাছে এই ধারাটি অত্যন্ত সমাদৃত।

১৯৮৯ সালে কিম্বারলি ক্রেনশ প্রথমবারের মতো ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিজমের ধারণা প্রবর্তন করেন। এই ধারাটি নির্যাতন-নিপীড়নের একধরনের শ্রেণিবিন্যাস তৈরি করেছে, নারীবাদকে সম্পৃক্ত করেছে নাগরিক অধিকারের সাথে। তাদের মতে—লিঙ্গ, বর্ণ, জাতিতত্ত্ব, শ্রেণি এবং সক্ষমতাভেদে নারীদের নিপীড়িত হওয়ার মাত্রায় তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এটা প্রায় নিশ্চিত যে, একজন কালো বর্ণের নারী একজন ধনী শ্বেতাঙ্গ মহিলার তুলনায় সমাজে বেশি নিগৃহীত হবে। আর যদি সেই কালো বর্ণের নারী শারীরিকভাবে অসম্পূর্ণ বা অক্ষম হয়, তাহলে তো কথাই নেই। তবে একজন নারীবাদী যত বেশি নিপীড়িত হবে, ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিজমের বিবেচনায় সে তত বেশি মূল্যবান।

এ ধরনের নারীবাদীরা আবার চয়েজ ফেমিনিস্টদের ঘোর বিরোধী! প্রত্যেক নারীকে স্বাধীনভাবে নিজ পথ বেছে নিতে দেওয়ার পরিবর্তে তারা সবাইকে

একটি দল হিসেবে বিবেচনা করে। এই দলটির শিক্ষা ও বার্তায় সাম্যবাদী (Communist), সমাজতান্ত্রিক (Socialist) এবং মার্কসিস্ট (Marxist) মতাদর্শের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাদের বিশ্বাস, নারীবাদীরা কখনো অত্যাচারী হতে পারে না। মতাদর্শিক গোঁড়ামি, নিপীড়ন এবং পুরুষবিদ্বেষের ক্ষেত্রে অবশ্য এই বিশ্বাস বেশ কাজে দেয়। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, যে কারও বিরুদ্ধে পরিচালিত সহিংসতাকে বৈধতা প্রদানের জন্য এটা তাদের বহুল ব্যবহৃত এক কূটচাল ও সাফাই। এমনকি ভিন্নমতাবলম্বী অন্য নারীদের বেলায়ও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। সামাজিক ন্যায়বিচার আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিস্টরা নাগরিক অধিকার সচেতনতাকে সাফল্যের সাথে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু তাদের শ্বেতাঙ্গবিরোধী বর্ণবাদ, গোঁড়ামি এবং সামগ্রিক পুরুষবিদ্বেষী মনোভাবের কারণে খোদ সিভিল রাইটস আন্দোলনই পিছিয়ে গেছে অন্তত ৫০ বছর।

মতাদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও ফেমিনিস্টদের উভয় ধারাই বিশ্বাস করে, সুপরিকল্পিত নারী নিপীড়নের পেছনে মূলত পুরুষদের গোপন ষড়যন্ত্রই দায়ী। এই ষড়যন্ত্রতত্ত্বই তাদের বহুল আলোচিত পুরুষতন্ত্র (Patriarchy) হিসেবে পরিচিত। নিজেদের প্রতিটি কাজকে বৈধতা দেওয়ার জন্য তারা প্রায়শই এই কাল্পনিক পুরুষতন্ত্র বিরোধিতাকে ব্যবহার করে থাকে; যদিও ঐতিহাসিকভাবে পৃথিবীর কোথাও এই জাতীয় পুরুষতন্ত্র ছিল বলে বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ইতোমধ্যে ফেমিনিজমের প্রধান দুটি ধারার প্রাথমিক পরিচয় খোলাসা করা গেছে, এবার তাদের প্রোপাগান্ডা ও বিতর্কের কৌশলের দিকে নজর দেওয়া যাক। নারীবাদীদের ব্যবহৃত প্রতিটি কূটকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব, কিন্তু এত বিশাল বিষয়ের জন্য গোটা কয়েক স্বতন্ত্র বই দরকার। তাই আমি নারীবাদীদের কিছু সাধারণ কূটচালের ওপরই গুরুত্বারোপ করব, যেগুলোকে নিজেদের স্বার্থ হাসিল এবং সমালোচকদের কণ্ঠরোধের উপায় হিসেবে তারা নিয়মিত ব্যবহার করে চলেছে। অনুপ্রবেশ বা Entryism দিয়েই শুরু করা যাক। *অক্সফোর্ড লিভিং ডিকশনারি* অনুসারে এন্ট্রিজম বলা হয়—

> ‘কোনো রাজনৈতিক দলের নীতিমালা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করার অভিপ্রায়ে ভিন্ন কোনো দলের সদস্যদের অনুপ্রবেশ।’

নারীবাদীরা প্রায়ই এই কৌশলটি অবলম্বন করে থাকে। প্রথমে এরা নানান মিথ্যা বাহানা আর ছলচাতুরির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রভাবশালী দলে ভিড়ে যায়। এরপর দলগুলোকে ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে পুনর্গঠিত করে ফেলে

নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের স্বার্থে। আর সবশেষে এগুলোকে নবতর লক্ষ্যে পরিচালনা শুরু করে তারা। ১৯৩৪ সালে ট্রটস্কি প্রথম 'ফ্রেঞ্চ টার্ন'-এ অনুপ্রবেশতত্ত্বকে সমর্থন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল সর্বত্র লেলিনবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য সংস্থাকে নিজেদের মতাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা। আর নারীবাদের মধ্যে প্রথম এন্ট্রিজমের সফল প্রয়োগ ঘটান প্রভাবশালী ফেমিনিস্ট অনিতা সার্কেসিয়ান। তিনি ছিলেন একজন ভিডিও গেম ধারাভাষ্যকার এবং রাজনৈতিক কর্মী। সর্বসম্মুক্ষে তিনি আজীবন নিজেকে একজন ভিডিও গেমের অনুরাগী হিসেবেই দাবি করেছেন।

এই গেমস খেলার মাধ্যমেই নাকি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, অনেক ভিডিও গেম লিঙ্গবৈষম্যের দোষে দুষ্ট। গেমিং সমাজে গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে দারুণ চতুরতার সঙ্গে এই অভিযোগটি ব্যবহার করেছিলেন সার্কেসিয়ান। চরমপন্থি ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিজমকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এটি কার্যকর একটি প্ল্যাটফর্ম দিয়েছিল তাকে। চিন্তা-ভাবনায় মারাত্মক চরমপন্থি এই ব্যক্তি মনে করতেন, ভিডিও গেমের সবকিছুই সেক্সিস্ট এবং নারীবিদ্বেষী। এমন একজন লোককে 'অতি গোঁড়া' বলা নিশ্চয়ই খুব একটা দোষের কিছু নয়!

যাহোক, সার্কেসিয়ান রাতারাতি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়। এরপর ২০১১ সালের দিকে একটি ভিডিও প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায়, কলেজশিক্ষার্থীদের সামনে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং অকপটে স্বীকার করছেন—তিনি কখনোই ভিডিও গেমের অনুরাগী ছিলেন না। শুধু তা-ই নয়, কোনোরূপ রাখঢাক না রেখেই সেই বক্তৃতায় স্বীকারোক্তি দেন—নেহায়েত ফেমিনিজম ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই ভিডিও গেম শিখেছিলেন তিনি। ভিডিও গেমের জগতে জড়ানোর প্রেরণার উৎস বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন—

> 'আমি ভিডিও গেমের ভক্ত নই। মূলত আমাকে এটি শিখতে হয়েছিল নারীবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে।'

অথচ নারীবাদী ভিডিও গেমের ধারাভাষ্যকার হিসেবে তার পুরো ক্যারিয়ারই দাঁড়িয়ে আছে একটা মিথ্যার ওপর—'আমি আজন্ম ভিডিও গেমের ভক্ত।' ভিডিও গেমিং জগৎ এবং প্রযুক্তি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্তরে প্রবেশ করার জন্য সারাজীবন তিনি বারবার এই মিথ্যা আওড়ে গেছেন। কিন্তু এই মিথ্যা এতটাই সফল হয়েছিল যে, ইন্টারনেটে নারীবাদবিরোধী বার্তা ও সমালোচনার ওপর সেন্সরশিপ আরোপের পক্ষে কথা বলার জন্য জাতিসংঘে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তাকে।

প্রায় প্রতিটি শিল্পে, সমস্ত পশ্চিমা সরকারে আমরা ফেমিনিস্টদের এই অনুপ্রবেশ দেখতে পাই। খেলাধুলা, শিক্ষা কিংবা স্বাস্থ্যসেবা—প্রত্যেকটি খাতে অনুপ্রবেশ করেছে তারা। নারীবাদী আদর্শকে সমর্থন করে—এমন রাষ্ট্রীয় নীতিমালা তৈরি ও বহাল রাখার উদ্দেশ্যে ফেমিনিস্টরা বিশ্বজুড়ে গড়ে তুলেছে নিজস্ব সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বৃহত্তর নেটওয়ার্ক। এ রকম দুটি সংস্থা হচ্ছে—League of Women Voters এবং National Organization of Women। এই সংগঠনগুলো কেবল নারীবাদী মতাদর্শকেই প্রচার করে না, অধিকন্তু নারীবাদী প্রার্থীদের জন্যও সরকারি অফিসগুলোতে প্রচার-প্রচারণা চালায়। একই সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে তাদের পছন্দের প্রার্থীর আক্রমণে অর্থলগ্নিও করে।

পশ্চিমা বিশ্বের বেশির ভাগ নারীকেন্দ্রিক (Gynocentric) আইন এবং আইনিব্যবস্থার জন্য মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে থাকা পুরুষবিদ্বেষী এই সব নেটওয়ার্কই দায়ী। তাদের আইনি সহায়তা করতে লিঙ্গ পক্ষপাতদুষ্ট পারিবারিক আদালত ছাড়াও রয়েছে 'ভায়োলেন্স এগেইন্সট উইমেন অ্যাক্ট'-এর মতো বিশেষায়িত বিধিব্যবস্থা, যেগুলো কেবল নারীদেরই সুরক্ষা দেয় এবং সব সময় অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায় পুরুষদের। পরবর্তী অংশে তাদের সেসব পলিসি এবং তার কিছু কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর সময় কিংবা নিজেদের ভণ্ডামি ধরা পড়ে গেলে তারা স্বীয় আদর্শের পক্ষে অত্যন্ত সস্তা, অনৈতিক এবং মাথা খেলানো কিছু কূটচাল অবলম্বন করে। কখনো কখনো খুলে বসে কুতর্কের দোকান। যতক্ষণ না তাদের এই অনৈতিক কৌশলের ফাঁদ সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন, আপনি নারীবাদী যুক্তিগুলোকে প্রতিহত করতে পারবেন না; বরং প্রতিবাদ করতে গেলেই তারা দলবেঁধে তেড়ে আসবে আপনার দিকে। আপনার কথার সাথে জুড়ে দেবে 'হেইট স্পিচ'-এর তকমা। আর ক্রমাগত আক্রমণ ও হইচইয়ের কথা তো বলাই বাহুল্য।

এই বিষয়টা মাথায় রেখে আমি নারীবাদীদের ব্যবহৃত সাধারণ কৌশলগুলো খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব; যেন তাদের পাল্লায় পড়ে লাগাতার কুযুক্তির মুখে আপনি খেই না হারিয়ে ফেলেন। কারণ, যেকোনো যৌক্তিক বিরোধিতা এবং সমালোচনার জবাবে তারা মূল আলোচনায় যাওয়ার আগেই সবার কণ্ঠরোধ করে ফেলে। নিঃসন্দেহে এটা একধরনের সেন্সরশিপ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা। সম্ভবত নারীবাদীদের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কৌশল হলো এই প্রসঙ্গ বিচ্যুতি বা Deflection। এটি তাদের কুতর্কের অন্যতম উপায়। বিচ্যুতির একটা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে *আরবান ডিকশনারিতে*—

'Deflecting Argument হলো—যখন কেউ আপনার বিরুদ্ধে কিছু বললে সেখান থেকে দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। নিজেদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তারা চূড়ান্ত নিশ্চুপ থাকবে; বরং তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে চলে যাবে অন্য আলোচনায়। কেননা, তারা খুব ভালো করেই জানে—যদি মূল বিষয়ে কথা বলে কিংবা অভিযোগের জবাব দিতে যায়, তাহলে তাদের আসল উদ্দেশ্য নস্যাৎ হয়ে যাবে।'

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি কোনো পাঁড় ফেমিনিস্টকে ইঙ্গিত করে বলেন যে, সে পুরুষবিদ্বেষী এবং সেক্সিস্ট, বাকি নারীবাদীরা তখন মূল অভিযোগ এড়িয়ে আপনাকে বলবে—'সব নারীবাদী তো এমন নয়।' কিংবা হাস্যকরভাবে বলে উঠবে—'তিনি মূলত প্রকৃত নারীবাদী নন।' তাদের এই জবাবগুলোর কোনোটিতেই পুরুষবিদ্বেষের ব্যাপারে কোনো সমালোচনা কিংবা অভিযোগ নেই। এসবই বরং মূল পয়েন্ট থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা। কারণ, নারীবাদীরা জানে, অভিযোগগুলো সত্য এবং এগুলোতে তাদের আন্দোলনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ভণ্ডামির কালো বেড়াল উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

নারীবাদীদের এই গোঁড়ার কৌশল আমাদের তাদের দ্বিতীয় কূটচালের শিকারে পরিণত করে। আর সেটি হলো—ব্যক্তিগত আক্রমণ ও অপমান। ব্যক্তিগত আক্রমণের সুবিধা হচ্ছে—কোনো অকাট্য যুক্তি থাকে না, থাকলে এটি অনায়াসেই ব্যবহার করা যায়। ব্যক্তিগত আক্রমণের অর্থ পরাজয় মেনে নেওয়া। ব্যক্তিগত আক্রমণ বা শেমিং মূলত ডিফ্লেকশনেরই একটা শাখা। যদি আপনি ফেমিনিস্টদের কর্মকাণ্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা সেটার জবাব দেওয়ার পরিবর্তে আপনার ওপর চড়াও হবে। এই বলে আক্রমণ করে বসবে—'আপনি মূলত একজন সেক্সুয়ালি ফ্রাস্টেটেড উগ্র মানুষ!' বইয়ের পাতায় পাতায় ফেমিনিস্টদের এ জাতীয় ব্যক্তিগত আক্রমণের উদাহরণ ভূরিভূরি।

নারীবাদীদের ব্যবহৃত আরেকটি সাধারণ কৌশল হলো পুনর্বিন্যাস (Reframing) এবং মিথ্যা তুলনা (False Comparisons); যাকে দ্বিভাজনও (Dichotomies) বলা হয়। কার্যত এই দুটিই ভিন্ন ভিন্ন কৌশল। তবে এরা এতটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, প্রায়ই মনে হয় একটি আরেকটির পরিপূরক। সমালোচকদের বিভ্রান্ত করতে নারীবাদীরা এই দুটির একটি থেকে আরেকটিতে ক্রমাগত যাওয়া-আসা করতে থাকে। এটি ডিফ্লেকশনেরই আরেক রূপ।

রিফ্রেমিংয়ের একটা জম্পেশ উদাহরণ হলো—পুরুষের পক্ষ থেকে অধিকার ও লিঙ্গসমতার দাবি উঠলে নারীবাদীরা সেটাকে নারীবিদ্বেষ বা মিসোজিনি হিসেবে দাগিয়ে দেয় আবার মিথ্যা ধর্ষণ মামলায় হেনস্তা হওয়ার পর যদি অন্য কোনো পুরুষ তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে, তাকে বানিয়ে দেওয়া হয় ধর্ষণ সমর্থক বা সম্ভাব্য ধর্ষক। আর কোনো উপায় খুঁজে না পেলে শেষ অস্ত্র হিসেবে ফেমিনিস্টরা মিথ্যা তুলনার ফুলঝুড়ি নিয়ে বসে। অথচ আদতে সেগুলোর কোনো অস্তিত্বই নেই। উদাহরণস্বরূপ, তাদের যুক্তিমতে কেউ যদি নারী-পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাস করে, তাহলে সেও নাকি একজন নারীবাদী! এর থেকে ডাহা মিথ্যা আর কী হতে পারে! সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন, ফেমিনিস্টরা লিঙ্গসমতায় নয়; নারীকেন্দ্রিকতায় (Gynocen Trism) বিশ্বাসী। নারীবাদীদের বক্তৃতা শুনলে সেটি খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারবেন। এ দুটি কৌশলই ফেমিনিজমবিরোধীদের কণ্ঠরোধে ব্যবহৃত বহুল প্রচলিত অস্ত্র। যেকোনো যুক্তিসংগত ইস্যুতে বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা এড়িয়ে যেতে তারা এগুলো ব্যবহার করে থাকে।

যদি লিঙ্গসমতা বাস্তবায়নই ফেমিনিস্টদের উদ্দেশ্য হতো, তাহলে কখনোই তারা সমালোচকদের কণ্ঠরোধ করতে এসব কূটকৌশলের আশ্রয় নিত না। আসলে তারা সমতার কথা বলে না, ফেমিনিজম চায় স্রেফ নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব (Female Superiority)। বিতর্ক এড়ানোর জন্য ফেমিনিস্টদের সর্বশেষ মোক্ষম অস্ত্র হচ্ছে সিনক্রিয়েট করা। এটি একই সঙ্গে তাদের অস্ত্রভান্ডারের সবচেয়ে কার্যকর এবং নিকৃষ্ট কূটচাল। এক্ষেত্রে তারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লিঙ্গবৈষম্য, লাঞ্ছনা, হয়রানি অথবা সহানুভূতি পাওয়া যাবে—এ রকম যেকোনো অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ আনতে শুরু করে। ধীরে ধীরে তাদের মিথ্যা অভিযোগকে আরও রংচং দেয়। যে লোক ইতঃপূর্বে তাদের সাথে অসম্মতি পোষণ করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল, তার মর্যাদার বারোটা বাজাতে গড়ে তোলে জনসংযোগ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অনলাইন ভিডিওতে এমন অসংখ্য উদাহরণ থাকলেও আমাদের মিডিয়াগুলো বেছে বেছে কেবল ফেমিনিস্টদের মিথ্যাচারগুলোই প্রচার করে থাকে। ফেমিনিস্টদের এই ভণ্ডামি মোকাবিলার জন্য দুটি অস্ত্রই যথেষ্ট—যুক্তি ও বাস্তবতা।

অকাট্য বাস্তবতা এবং প্রামাণ্য যুক্তির ওপর নির্ভর করলে যেকোনো ফেমিনিস্ট বিতর্কই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা সম্ভব। যখনই তারা আপনার মত দমন করতে নানাবিধ কূটকৌশলের আশ্রয় নেবে এবং মূল ইস্যুতে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানাবে, বুঝে নেবেন আপনি জিতে গেছেন। তবে বিতর্কে আপনি যতই জেতেন না কেন; কখনোই তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করবে না।

ফেমিনিস্টদের উপেক্ষিত ইতিহাস

নারীবাদী আন্দোলনের অস্তিত্ব না থাকলে নারীরা আজকে যেসব অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে, সেসব থেকে বঞ্চিত হতো—এই ধরনের একটা তথ্য ফেমিনিস্টরা মিডিয়ার মাধ্যমে দিনরাত ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাদের মতে একটি দীর্ঘস্থায়ী পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ফলে নারীরা অর্থনৈতিক ও অ্যাকাডেমিক সফলতাসহ সর্বত্র বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আসছিল। সত্যিই কি তা-ই? বাস্তবতা বলে—ব্যাপারটা মোটেই সে রকম নয়; বরং নারীবাদীদের এই দাবি শতভাগ বানোয়াট। ফেমিনিস্টরা এক্ষেত্রে ইতিহাসের ওপর গুরুত্বারোপের বিষয়টি সর্বদা উপেক্ষা করে পালিয়ে বেড়ায়। কারণ, নারীদের ওপর একতরফা পুরুষতান্ত্রিক নির্যাতনের এই দাবি ইতিহাসের বাটখারায় একেবারেই উত্তীর্ণ নয়; বরং ইতিহাস ঘাঁটলে আপনি দেখতে পাবেন—আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও আগে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল; এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষের চেয়েও বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিল নারীরা। ইতিহাসে এ রকম ভূরিভূরি ক্ষমতাশীল নারী রয়েছেন—যাদের এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

তবে আমি এখানে অল্প কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরব। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করব—নারীবাদীরা কীভাবে তাদের নির্যাতন-নিপীড়নের মিথ্যা কাসুন্দি ঘেঁটে যাচ্ছে। কীভাবে প্রতারণাপূর্ণ শঠতায় প্রভাবিত করছে ইতিহাসের বয়ান। আমাদের প্রথম উদাহরণ আফ্রিকার দেশ মিশর থেকে। প্রাচীন শাসকদের মধ্যে মিশরের রানি ক্লিওপেট্রা ছিলেন পৃথিবী বিখ্যাত।

প্রকৃতপক্ষে মিশরের সাতজন রানির নাম ছিল ক্লিওপেট্রা। যদি সেখানে আদৌ পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থাকত, তাহলে সাতজন রানির মধ্যে কেউই মিশরের সর্বোচ্চ শাসক হতে পারতেন না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো– উক্ত সাতজন ছাড়াও আরও অনেক রানি পেয়েছিল মিশর। বলা দরকার, দেশটি বরাবরই ছিল নারী শাসকদের জন্য সুবিদিত। মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের পঞ্চম ফারাও হাতশেপসুত ছিলেন একজন নারী। ১৪৭৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করেন। আবার স্বামীর সাথে যৌথভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন রানি তিয়ে।

শোনা যায়, এই ক্ষমতাবান নারীর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা এতটাই বেশি ছিল যে, বিদেশি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা রাজার তুলনায় তাকেই প্রাধান্য দিত বেশি। মিশরের আরেকজন রানি ছিলেন নেফেরতিতি। স্বামীর মৃত্যুর পর মিশরের হাল ধরেছিলেন তিনি। তবে মিশর শাসন করা প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রানি ছিলেন দ্বাদশ রাজবংশের শাসক সবেকনেফেরু। অবশ্য ইতিহাসের পাতা উলটালে তার আগেও কমপক্ষে ছয়জন রানির উল্লেখ পাওয়া যায়। বাস্তবতা হলো, বিভিন্ন সময় মোটামুটি কয়েক ডজন নারী দ্বারা শাসিত হয়েছে আফ্রিকা। তাদের অনেকের আবার একাধিক ক্রীতদাসও ছিল ।

১৯১৩ সালে প্রকাশিত ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়া জানাচ্ছে–একজন স্প্যানিশ নারী জুলিয়ানা মোরেল মাত্র চার বছর বয়সে গ্রিক, ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষা শিখতে শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি পদার্থবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, নাগরিক আইন ও ধর্মশাস্ত্রে বিস্তারিত তালিম নেন। ১৬০৮ সালে জুলিয়ানা যখন আইনে তার প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রিটা অর্জন করেন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর।

সে সময় যদি নারী নিপীড়নকারী পুরুষতান্ত্রিকতা থাকত, জুলিয়ানার পক্ষে কখনোই প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব হতো না। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিপীড়িত ছিলেন না; আর দশজন সফল ব্যক্তির মতোই তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। সেই প্রচেষ্টা মোটেই বৃথা যায়নি; বরং সম্মান ও সাফল্যের পসরা নিয়ে ফিরে এসেছিল তার জীবনে।

আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমি জোয়ান অব আর্ক এবং ইতিহাসজুড়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ শাসন করা কিছু রানির কথা উল্লেখ করব। আপনারা যদি এ প্রভাবশালী নারী শাসকদের সম্পর্কে আরও সবিস্তারে জানতে চান, আমি সুনিশ্চিত যে ইন্টারনেটে ইউরোপিয়ান ইতিহাস অনুসন্ধান করলেই তা পেয়ে যাবেন।

১৬৩৯ সালে আমেরিকায় L'Ecole des Ursulines de Quebec নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় ছিল; বর্তমান যা মেইনে অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি একসময় একচেটিয়াভাবে মেয়েদের শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিল। স্বভাবতই সেখানে ছেলেদের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। তারপরও পুরুষতন্ত্র কীভাবে নারীবাদীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রেখেছে, সেই অভিযোগ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। এ মহিলা কলেজগুলো এখনও পর্যন্ত চালু রয়েছে। কোনো পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এদের বাধা প্রদান করলে প্রায় ৪০০ বছর ধরে এগুলো সফলতার সাথে চলমান থাকার কথা নয়।

১৬৩৯ সালের ৪ অক্টোবর মার্গারেট ব্রেন্ট প্রথম নারী হিসেবে আমেরিকায় নথিভুক্ত ভূমির মালিকানা পান। প্রাথমিকভাবে সেটার পরিমাণ ছিল ৭০ একর; যদিও পরবর্তী সময়ে তিনি ও তার বোনদের প্রত্যেকে ৮০০ একর করে ভূমির মালিক হন। মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের গভর্নর লর্ড কালভার্ট ব্রেন্টকে এত বেশি বিশ্বাস ও সম্মান করতেন যে, নিজের ভূ-সম্পত্তির নারী নির্বাহক হিসেবে নিয়োগ দেন তাকে। নারীবাদের প্রথম ধাপের (First Wave) পূর্বেই সমাজে নারী নেতৃত্ব থাকার এই সব দৃষ্টান্ত ফেমিনিস্ট কথিত নারী নিপীড়নের ঐতিহাসিক মিথ্যাচারের গালে মোক্ষম চপেটাঘাত। তবুও নারীবাদীদের অহরহ বলতে শোনা যায়—যুগে যুগে নারীদের সফলতা অর্জনকে অসম্ভব করে তুলেছিল পুরুষদের উৎপীড়ন!

শাসনকাঠামো এবং অর্থনীতির মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও নারীদের অংশগ্রহণের ইতিহাস বেশ পুরোনো। ১৮৩৩ সালের প্রথম দিকে ওবার্লিন কলেজে মেয়েদের ভর্তির অনুমতি ছিল। মার্কিন নিউজ অনুসারে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করা প্রথম নারী ছিলেন ক্যাথরিন ব্রিওয়ার। ১৮৪০ সালের ১৬ জুলাই জর্জিয়ার ম্যাকাওয়ের ওয়েসলিয়ান কলেজ থেকে তিনি স্নাতক সম্পন্ন করেন। ১৮৬২ সালে প্রথম আফ্রো-আমেরিকান নারী হিসেবে ওবার্লিন কলেজ থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেন মেরি জেন প্যাটারসন। আরও এক ধাপ এগিয়ে ছিলেন হেলেন ম্যাগিল। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্রীই প্রথম আমেরিকান নারী, ১৮৭৭ সালে প্রথমবারের মতো যিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯০০ সালেরও আগে থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষদের মতো নারীরাও কলেজে স্নাতক সম্পন্ন করার সুযোগ পেতেন।

এই আলোচনায় নারীদের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশের কথা তুলে ধরা হলো, যারা অ্যাকাডেমিক, সামাজিক ও সরকারি ক্ষেত্রে তাদের সামসময়িক পুরুষদের মতো

বা তাদের চেয়েও বেশি সফলতা অর্জন করেছিলেন। ইতিহাসের এই অধ্যায় সম্পর্কে কেউ অবগত হোক, ফেমিনিস্টরা তা একদমই চায় না। এখন ক বিখ্যাত ফেমিনিস্টের কথা উল্লেখ করা যাক, গোটা পৃথিবীব্যাপীই যারা নারীবাদী মতাদর্শের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে বরণীয়। নারীবাদীরা তাদের ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে গেলেই তেঁতিয়ে ওঠে—কীভাবে তারা সমান বেতন থেকে শুরু করে ভোটাধিকার, জাতিগত সমতা এবং লিঙ্গসমতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সাম্য নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রেখেছে। নারীবাদীদের এসব আলাপ শুনে আপনার মনে হতে পারে—আরে! তারা তো সময়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান! কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ একটি অপব্যাখ্যা এবং আগাগোড়া বিকৃত ইতিহাস (Revisionist History)।

ইতিহাসজুড়ে বরং দেখা যায়, বেশির ভাগ ফেমিনিস্ট ছিল গোঁড়া এবং কট্টর পুরুষবিদ্বেষী। শুরুর দিকের এই নারীবাদীরা তাদের বর্ণবাদ এবং গোঁড়ামিগুলো গোপন করার কোনো চেষ্টাই করেনি। তাই আধুনিক নারীবাদীরা যখন দাবি করে—ঐতিহাসিক এ ব্যক্তিত্বরা সমতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল, সেটা কেবল অনৈতিহাসিকই নয়; ভয়ংকর প্রোপাগান্ডাও বটে। তারা সব সময় মূলত নারী কেন্দ্রিকতাকেই সমর্থন করেছিল। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণহত্যারও পক্ষে ছিল তারা!

ইংরেজ নারী ম্যারি ওলস্টোনক্রাফটকে দিয়েই শুরু করা যাক। তিনি ব্রিটিশ ফেমিনিজমের অগ্রদূত হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত। ১৭৯২ সালে তার নারীবাদবিষয়ক প্রথম বই *অ্যা ভিন্ডিকেশন অব দ্যা রাইটস অব উইমেন* প্রকাশিত হয়। ধারণা করা হয়—নারীবাদের ফার্স্ট ওয়েভের সূচনা হয়েছিল এই বইয়ের মাধ্যমেই। এটি ফেমিনিজমের ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। ওলস্টোনক্রাফট তার বইয়ে সমানাধিকারবাদের (Egalitarianism) মতো নারী ও পুরুষের মধ্যে আরও বেশি সামাজিক ও নৈতিক সমতার পক্ষে কথা বলেন।

ওলস্টোনক্রাফটের বইয়ের আকর্ষণীয় দিক হলো খোদ নারীদের নিয়ে সমালোচনা। তিনি বলেছেন—নারীরা ভালো দিকগুলো অর্জনে ব্যর্থ হয়ে সভ্যতার সমস্ত মূর্খতা ও দোষ আয়ত্ত করেছে। নারীদের ব্যাপারে কঠোরতর সমালোচনা অব্যাহত রেখে তিনি আরও বলেন—এদের আবেগ ভীষণ সংবেদনশীল, বেশির ভাগ নারীই নিয়ন্ত্রিত হয় নিজেদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি দ্বারা। এটা কেবল তাদের জন্যই অস্বস্তিকর নয়; বরং অন্যদের জন্যও ঝামেলাপূর্ণ। তারা কেবল এতটাই আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ে যে, ন্যূনতম হিতাহিত জ্ঞানটুকু থাকে না।

ওলস্টোনক্রাফটের মতে, যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়াই শুধু পরস্পরবিরোধী আবেগ-অনুভূতির আতিশয্যে নারীরা প্রায়ই দৃঢ় বিশ্বাস ও সাধনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে। তার শেষ কথা হচ্ছে—নারীরা তাদের আবেগকে উদ্দীপ্ত করার জন্য স্বীয় মননে আবেগ-অনুভূতির চাষাবাদ করে, যা তাদের দৃঢ় করে গড়ে তোলার পরিবর্তে বরং উন্মত্ততা ও মূর্খতার দিকে ধাবিত করে। এটা কোনো নারীবিদ্বেষী পুরুষাধিকার কর্মীর কথা নয়; বরং ফেমিনিস্ট আন্দোলনের একজন অগ্রদূতের বাণী। ভাবা যায়! আশ্চর্য হলেও সত্যি, ওলস্টোনক্রাফট ১৭৯২ সালে নারীদের যে সমালোচনা করেছিলেন, আজকে ২০০ বছর পরও নারীদের প্রতি অনুরূপ সমালোচনা অব্যাহত রয়েছে।

৩৮ বছর বয়সে ওলস্টোনক্রাফটের মৃত্যুর পর স্বামী উইলিয়াম গডউইন তার জীবনী লেখেন। এতে তিনি ওলস্টোনক্রাফটের পরকীয়া, জারজ বাচ্চার জন্ম এবং তার মানসিক অস্থিতিশীলতার কথা ফাঁস করে দেন। বই থেকে আরও জানা যায়—এসব কারণে নাকি একাধিকবার আত্মহত্যাও করতে চেয়েছিল এই মহিলা। সুতরাং এটা অনুমান করা মোটেই অন্যায্য নয় যে, নারীদের নিয়ে ওলস্টোনক্রাফটের সমস্ত কট্টর সমালোচনার মূলভিত্তি ছিল তার নিজের বিচ্ছিরি ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা।

এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টন আমেরিকান ফেমিনিস্ট আন্দোলনের প্রথম দিককার একজন নেতা। প্রথম জীবনে আরেকজন বিখ্যাত নারীবাদী সুসান বি অ্যান্থনির ঘনিষ্ঠ সহকারী ছিলেন তিনি। মার্কিন মুদ্রায় একসময় এই সুসানের চিত্র ছিল। ১৮৬৮ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে নারী ভোটাধিকার সম্মেলনে স্ট্যান্টন একটি বক্তৃতা দেন। বক্তব্যের একদম শুরুতেই তিনি বলেন—'পুরুষ হলো একটি ধ্বংসাত্মক শক্তি। কঠোর, স্বার্থপর এবং উদ্ধত্য। সে যুদ্ধ, সহিংসতা, দখল আর ভোগ করতে ভালোবাসে। বাস্তবতা ও নৈতিকতার দুনিয়ায় সে অনৈক্য, হাঙ্গামা, ব্যাধি এবং মৃত্যু বয়ে আনতে চায়।'

যদি সে সময় নারী নিপীড়নকারী পুরুষতন্ত্র থাকত, তবে সে ওয়াশিংটন ডিসিতে দাঁড়িয়ে এসব বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে পারত না; এমনকি নারী ভোটাধিকার সম্মেলনের অস্তিত্বই থাকত না। বক্তৃতার শেষে অবশ্য তিনি পরিষ্কার করেন—তার মন্তব্য কিছু পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সব পুরুষের ক্ষেত্রে নয়। যাহোক, তিন দশক পর তিনি পুরুষদের সম্পর্কে তার প্রকৃত অনুভূতি স্বীকার করেন। ১৮৯০ সালের ২৭ ডিসেম্বর তিনি তার দিনলিপিতে লেখেন—'লিঙ্গ হিসেবে আমরা পুরুষদের চেয়ে বহুগুণে উন্নত।'

নিঃসন্দেহে তিনি সমতায় বিশ্বাস করতেন না; বরং তার মতবাদ ছিল শ্বেত আধিপত্যবাদ এবং নারীকেন্দ্রিকতা। এ ছাড়াও তিনি ও অ্যান্থনি উভয়ে প্রকাশ্যে তাদের বর্ণবাদ স্বীকার করেছেন; যদিও তারা বিলোপবাদীদের (Abolitionists) সাথে কাজ করতেন। আফ্রো-আমেরিকান কালো মানুষদের ভোটাধিকার প্রসঙ্গ এলেও একসঙ্গে বিরোধিতা করেছিলেন তারা। প্রথম দিককার নারীবাদীদের মধ্যে এ ধরনের বর্ণবাদ খুবই সাধারণ বিষয় ছিল। নারীবাদীদের অন্তর্গত বর্ণবাদের অসংখ্য উদাহরণ বইয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। সুতরাং এখানে আমি সেসবের বিস্তারিত ফিরিস্তি দেবো না।

ফেমিনিজমকে বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই আমেরিকার সুপ্রজননবিদ্যা (Eugenics) আন্দোলন কীভাবে নারীবাদ, নাৎসিবাদ এবং ইহুদি গণহত্যাকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তা খতিয়ে দেখতে হবে। নারীমুক্তির নাম করে এ মতবাদ কীভাবে হাজার হাজার জার্মান ও লক্ষ লক্ষ ইহুদিদের হত্যা করতে সহায়তা করেছিল, তার বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা বাদ দিয়ে ফেমিনিস্ট ইতিহাসের কোনো পাঠই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

১৮৮৩ সালে ইংলিশম্যান ফ্রান্সিস গ্যাল্টন তার ইনকুয়েরিস ইন্টু হিউম্যান ফ্যাকাল্টি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট গ্রন্থে সুপ্রজননবিদ্যা শব্দটি প্রথম লিপিবদ্ধ করেন। মেরিয়াম ওয়েবস্টার-এর সংজ্ঞানুযায়ী—

> 'সুপ্রজননবিদ্যা হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা জাতি বা প্রজাতির বংশগত গুণাগুণ উন্নত করে।'

এই সুপ্রজননবিদরা প্রস্তাব করেছিল—বংশধারা উন্নয়নের পদ্ধতি অনুসরণ করে মানুষের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং অযোগ্য মানবধারা বিলুপ্ত করে দেওয়া হোক।

প্রস্তাবটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই আমেরিকার অভিজাত বর্ণবাদী আর শিক্ষাবিদরা সুপ্রজননবাদকে লুফে নেয়। তাদের তহবিল এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ইউজেনিক্সে রীতিমতো তুফান শুরু হয় সমগ্র আমেরিকাজুড়ে। বিপুল পরিমাণ অর্থ ঢালে কার্নেগি ইনস্টিটিউশন, রকফেলার ফাউন্ডেশন, হ্যারিম্যান রেলওয়ে ফরচুনসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান। ১৯০৩ সালে সেন্ট লুইসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রথম সুপ্রজননবাদ সংস্থা আমেরিকান ব্রিডার্স এসোসিয়েশন-এর উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির দিক থেকে এটিই ছিল এ জাতীয় সভার প্রথম নমুনা। সভার পর আন্দোলনের বেগ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে।

বিখ্যাত সুপ্রজননবিদ চার্লস বি ড্যাভেনপোর্ট ১৯১০ সালে ইউজেনিক্স রেকর্ড অফিস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ সালের মধ্যেই আমেরিকান সুপ্রজননবিদ্যা আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় অগ্রদূতে পরিণত হয় ড্যাভেনপোর্ট। ড্যাভেনপোর্টের সংস্থাটির কাজ ছিল সারা দেশের পরিবারগুলোর বংশগত তালিকা সংগ্রহ করা। বলা একান্তই বাহুল্য যে, এই তালিকার প্রয়োজন হয়েছিল সমাজের অগ্রগামী পরিবার থেকে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য পরিবারগুলোর বংশপরম্পরাকে আলাদা রাখার অসৎ ও বর্ণবাদী উদ্দেশ্যে।

১৯১২ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক ইউজেনিক্স সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আমেরিকান ব্রিডার্স এসোসিয়েশন তাদের সুপ্রজননবাদ সমিতির প্রারম্ভিক প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রিন্সটন, জন হপকিনস, হার্ভার্ড, কর্নেল, ইয়েল; এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতো সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকেও বিশিষ্ট চিকিৎসক, বিচারক, আইনজীবী ও শিক্ষাবিদরা উপস্থিত হয়েছিল এই সভায়। আমেরিকান ব্রিডার্স এসোসিয়েশন তাদের প্রতিবেদনে বলেছিল—ত্রুটিযুক্ত মানবশ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই তাদের উদ্দেশ্য। তারা এই শ্রেণির মানবসন্তানকে নৈতিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং সমাজের বোঝা হিসেবে চিহ্নিত করে। তাদের চিহ্নিত 'যোগ্য' মানবসম্পদের কাতারে অবলীলায় বাদ পড়ে দুর্বল, নিঃস্ব, অপরাধী, মৃগীরোগী, মানসিক বিকারগ্রস্ত, ক্ষীণকায়, রোগাক্রান্ত, বিকৃত, ইন্দ্রিয় ত্রুটিযুক্ত অসংখ্য মানুষ। কোনো রকম রাখঢাক না রেখে রীতিমতো তালিকা ধরে এসব মানুষকে সমাজের জন্য ভয়াবহ সংকট বলে সাব্যস্ত করা হয়। 'গুরুতর' এই সমস্যা সমাধানে তাদের টোটকা ছিল সামাজিকভাবে অযোগ্য বলে বিবেচিতদের নির্মূল করে ফেলা। 'যোগ্য ও টেকসই সমাজ' নির্মাণে তাদের প্রস্তাবিত সমাধানের মধ্যে ছিল—

- অযোগ্যদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নকরণ।
- খোজাকরণ বা বন্ধ্যাত্ব গ্রহণে জোর প্রয়োগ (Sterilization)।
- বিয়ে-শাদি নিয়ন্ত্রণ এবং বহুবিবাহ প্রতিরোধ।
- যন্ত্রণাহীন উপায়ে হত্যা।
- নন ম্যালথুনিসিয়ান মতবাদ তথা গর্ভধারণে কৃত্রিম হস্তক্ষেপ।

যন্ত্রণাহীনভাবে মৃত্যুর সোজাসাপ্টা অর্থ হচ্ছে (Euthanasia) মানবহত্যা। ভেবে দেখুন! মৃগী, অ্যালার্জি, হাঁপানি, অন্ধত্ব কিংবা অন্য কোনো জটিল রোগে আক্রান্ত অগণিত আদম সন্তানদের অপরাধীদের মতো অকাতরে মেরে ফেলতে চেয়েছিল এই তথাকথিত সমাজসেবকের দল। সে সময় রাজ্যে রাজ্যে 'জিম ক্রো'

নামে জাতিগত বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী আইন কার্যকর হয়েছিল। বিবাদকে অপরাধ হিসেবেও বিবেচনা করা হতো অনেক রাজ্যে। সুপ্রজননবিদ্যা অনুসারে কেউ যদি এই পৃথকীকরণের বিরোধিতা অথবা ভিন্ন জাতির বিয়ে আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই সংগত।

সুপ্রজননবাদীদের এই প্রস্তাব গণহত্যার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। কিন্তু ফেমিনিজমের সাথে এর সম্পৃক্ততা কোথায়?

বিখ্যাত নারীবাদী মার্গারেট স্যাঙ্গার সুপ্রজননবিদ্যার খুব স্পষ্টবাদী সমর্থক ছিলেন। সারা দুনিয়াব্যাপী তিনি পরিবার পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠাতা এবং ফেমিনিজমের আইকন হিসেবেও পরিচিত। মিসেস স্যাঙ্গারের অনেকগুলো লেখা মার্গারেট স্যাঙ্গার প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। পরবর্তী সময়ে তার রচনাবলি এবং বক্তৃতার উন্মুক্ত অনলাইন আর্কাইভ গড়ে তোলা হয় সেই প্রকল্পের আওতায়। সে সময় তার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আফ্রো-আমেরিকানদের নির্মূল করার জন্য বন্ধ্যাত্ব ও জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগের অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে। সচেতন মহল থেকে দাবি ওঠে, মার্গারেট স্যাঙ্গার সচেতন বর্ণবাদী এবং গণহত্যার ইন্ধনদাতা। স্যাঙ্গারের ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীরা অবশ্য চিরাচরিত প্রতারণার পথ ডিফ্লেকশনের মাধ্যমে তার কুৎসিত আদর্শকে সব সময় অস্বীকার করেছে। কিন্তু প্রবাদপ্রতিম এই নারীবাদীর বক্তব্যগুলোতে একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা সম্ভব, কতটা বিকৃত আর নির্মমতায় ঠাসা ছিল তার চিন্তাজগৎ। তিনি যেসব বিষয়কে সমর্থন করেছিলেন, তার প্রায় সবগুলোই এখনও তুমুল বিতর্কিত।

স্যাঙ্গার ১৯১৭ সালে জন্মনিয়ন্ত্রণ পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গর্ভপাত ও জন্মনিয়ন্ত্রণকে প্রকাশ্য সমর্থন জানান, নিজের ম্যাগাজিনকে ব্যবহার করেন শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদ ও গণহত্যাকারী সুপ্রজননবাদের পক্ষে শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে। স্যাঙ্গার দরিদ্রদের ঘৃণা করতেন। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি মেট্রোপলিটন ম্যাগাজিনে 'বার্থ কন্ট্রোল-মার্গারেট স্যাঙ্গারস রিপ্লাই টু থিওডোর রুজভেল্ট' শিরোনামে এক কলাম লেখেন। এতে তিনি দরিদ্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন—'বস্তিবাসীর সন্তান জন্মদানের চেয়ে বড়ো জাতীয় অপব্যয় আর কিছুই হতে পারে না।'

১৯১৯ সালের মার্চে তিনি আরেকটি সম্পাদকীয়তে লেখেন—'বর্তমানে চিকিৎসক, সমাজকর্মী, বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা, মানবতাবাদী সংস্থা এবং রাষ্ট্র কর্তৃক

শারীরিক ও মানসিকভাবে অযোগ্যদের মধ্যে জাতিগত অগ্রগতির যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে. তা কার্যত অপচয়। বলতে গেলে সমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলো নিতান্ত তুচ্ছ কাজে তাদের সময় ঢালছে। অযোগ্যদের বাস উপযোগী করে তোলার এই অনর্থক কাজে তারা ততদিন সময় দিতে থাকবে, যতদিন না মেডিকেল বিশেষজ্ঞরা বলে—এটি নিরর্থক।'

১৯২৫ সালের ২৫ মার্চে একটি বিশেষ নৈশভোজে বক্তৃতা দেওয়ার সময় স্যাঙ্গার বলেছিলেন—'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তার অভিবাসন আইনের বদৌলতে পৃথিবীর অগ্রদূতে পরিণত হয়েছে। বেশির ভাগ ব্রিটিশ শাসনকর্তারা যেভাবে চেয়েছিল, আজ মার্কিন সরকার ঠিক সেভাবেই অভিবাসন আইন প্রয়োগ করছে। সরকার যেভাবে আইন প্রয়োগ করে মানসিক ভারসাম্যহীন, শারীরিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ, নিঃস্ব এবং অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিদের এই দেশে প্রবেশ থেকে বিরত রেখেছেন, আমরা তা সমর্থন করি। শুধু এতটুকু আশা করি যে, তারা এই আইনগুলোর পরিধি আরেকটু বৃদ্ধি করে দেশের ভেতরকার অযোগ্য ব্যক্তিদের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রতিরোধ করবে।'

১৯৩৮ সালের ৩ মার্চ স্যাঙ্গার সর্বসম্মুক্ষে তার 'হিউম্যান কনসার্ভেশন অ্যান্ড দ্যা বার্থ কন্ট্রোল' বক্তৃতায় জাতিগত-বিশুদ্ধতার লক্ষ্যে নাৎসিদের দ্বারা নারীদের জোরপূর্বক বন্ধ্যাকরণ এবং হিটলারের আদর্শ অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জারি করা আইনের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন।

তারিখবিহীন একটি অপ্রকাশিত খসড়াতে স্যাঙ্গার লিখেছিলেন—'একজন কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন, আমাদের ১০০ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে কেবল ১৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা বুদ্ধিমান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। গড়ে বাকি ৮৫ মিলিয়ন মানুষের মানসিক দক্ষতা কম এবং সেটা একজন ১৫ বছরের কিশোরের সাথে তুলনীয়। এদের মধ্যে রয়েছে মূর্খ, দুর্বল, চূড়ান্ত নির্বোধ ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হলো ভিডিরি, পতিতা, অপরাধী, ভবঘুরে, মাতাল ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকে জন্ম থেকেই ত্রুটিযুক্ত।'

একই খসড়ায় তিনি আরও বিবৃত করেন—'এই শ্রেণিগুলোর মাঝে জীবনীশক্তি, নৈতিকতা, কর্মস্পৃহা অনুপস্থিত। যেকোনো যূথবদ্ধ কর্মকাণ্ডের জন্যও এরা সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য। প্রতিকূল পরিবেশ অযোগ্যদের ধ্বংস করে ফেলে এবং যোগ্যদের বেঁচে থাকার জন্য জায়গা করে দেয়। অযোগ্যদের তাদের মতো বৈশিষ্ট্য বহনকারী অধিকতর অযোগ্য সন্তান জন্মদান অনুমোদনের মাধ্যমে আমরা মূলত জীবনের স্তরকে নিম্নমানের করে তুলতে সাহায্য করছি।'

১৯৩৯ সালের ১০ ডিসেম্বরে মার্গারেট স্যাঙ্গার ডক্টর সি. জে. গ্যাম্বলের নিকট একটি চিঠি লেখেন। সেখানে বলেন—'আমি কেবল নিগ্রো প্রকল্পের সাথে জড়িত থাকতে চাই। মিস রোজ আপনার চিঠির একটি অনুলিপি আমাকে পাঠিয়েছেন এবং আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি একজন ফুলটাইম নিগ্রো চিকিৎসক নিয়োগ করা উপযুক্ত কি না—সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি নর্থ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, টেনেসি এবং টেক্সাসে ছিলাম। সেখানকার অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়, অশ্বেতাঙ্গ নিগ্রোরা শ্রদ্ধাবসত শ্বেতাঙ্গ ডাক্তারদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। অথচ নিজ জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে তারা যথেষ্ট অন্তরঙ্গ। মনে হয় তারা মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। শ্বেতাঙ্গদের সাথে তারা খুব একটা মেশে না। যদি আমরা ক্লিনিকে কোনো নিগ্রো ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ দিতে পারি, তাহলে তিনি তাদের মাঝে উদ্যম এবং জ্ঞান নিয়ে যেতে পারবেন। আমি বিশ্বাস করি, এটি অশ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সুদূরপ্রসারী ফলাফল সৃষ্টি করতে সক্ষম। আমার মতে, নিগ্রো চিকিৎসকের কাজ সম্পূর্ণরূপে নিগ্রো পেশাজীবী ও নার্স, হাসপাতাল, সমাজকর্মীদের সাথেই হওয়া উচিত। যেমন শ্বেতাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের সাথে করে থাকে। আর এক্ষেত্রে সাফল্য নির্ভর করবে তার ব্যক্তিত্ব এবং আমাদের প্রশিক্ষণের ওপর।

এখন আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—এই নিগ্রো প্রকল্পের উদ্দেশ্য কী ছিল? চিঠির পরবর্তী সময়ে তিনি সেটা খোলাসা করেছেন। বলেছেন—'আমরা নিগ্রো জনগোষ্ঠী নির্মূল করতে চাই। তবে এই বিষয়টা ফাঁস হয়ে যাক, তা আমি চাই না।'

স্যাঙ্গারের লক্ষ্য ছিল বন্ধ্যাকরণ ও গর্ভপাতব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে আফ্রো-আমেরিকানদের জন্মনিয়ন্ত্রণ। পাড় ফেমিনিস্ট স্যাঙ্গার তার বর্ণভুক্ত নয় এবং অভিজাত সামাজিক অবস্থানে নেই—এমন প্রত্যেককে গোপন সুপ্রজননবিদ্যার মাধ্যমে নির্মূল করতে তার প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করেছিলেন। নারীবাদের কী অদ্ভুত সমতা!

সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো—কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা পরিবার পরিকল্পনার নামে প্রকাশ্যে এবং সানন্দে এই গর্ভপাতের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। ১৯১০ সালে আমেরিকার জনসংখ্যার প্রায় ১৫% মানুষ ছিল কৃষ্ণাঙ্গ। মাত্র ১০০ বছরের ব্যবধানে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১৩%-এরও নিচে। দুঃখজনক হলেও সত্য, এসব পরিকল্পিত বর্ণবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষার বলি হয়েছিল কেবল আফ্রো-আমেরিকান সম্প্রদায়।

বেশির ভাগ বিখ্যাত নারীবাদীর মতোই মার্গারেট স্যাঙ্গারের কপটতা এবং গোপন কার্যাবলি এতটাই নিকৃষ্ট ছিল যে, পরবর্তী সময়ে অন্যদের জন্য তা অনুসরণ করা দুরূহ হয়ে ওঠে। কিন্তু গ্লোরিয়া ছিলেন আরও বেশি উগ্র। তার ফেমিনিস্ট ক্যারিয়ার এমনকি স্যাঙ্গারকেও ছাড়িয়ে যায়। রুথ ও লিও গ্লোরিয়া দম্পতির কন্যা গ্লোরিয়া ১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন ইতিহাসের বই যথাসম্ভব সংযত ভাষায় বয়ান করেছে যে, তার মা ছিলেন অনেক বেশি সহিংসতাপ্রবণ এবং মানসিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত। ইহুদি নারীদের দলিল সংরক্ষণাগারের নথি অনুসারে, শীতকালে তার বাবা ভ্রাম্যমাণ অ্যান্টিক ব্যবসায়ী হিসেবে কাজ করতেন। এসব ভ্রমণে প্রায়ই নিজের পরিবারকে সাথে নিয়ে যেতেন তিনি।

জুইশ ওমেন'স আর্কাইভ আরও জানায়, ছোটোবেলায় নাইট ক্লাবের চিত্তবিনোদনকারীদের নিকট প্রশিক্ষণ নিয়েছিল গ্লোরিয়া। ১৯৪৫ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে তার বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এরপর শিশু গ্লোরিয়া মায়ের াথে চলে যায় ওহাইওর টলেডোতে। কৈশোরে উপনীত হওয়ার পর স্থানীয় এক নাইট ক্লাবে এক রাত ১০ ডলারের বিনিময়ে একটি কাজ পায়। জুইস ওমেন'স আর্কাইভের তথ্যমতে—

> 'পরের বছর তার বোন সুসান তাকে উদ্ধার করে এবং বিচ্ছেদ সত্ত্বেও সে তার বাবাকে মায়ের জন্য এক বছরের খোরপোশ দিতে রাজি করায়। উদ্দেশ্য ছিল গ্লোরিয়াকে বৃদ্ধ মায়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া। এরপর বোনের সাথে ওয়াশিংটন ডিসিতে পাড়ি জমান গ্লোরিয়া।'

প্রশ্ন হলো—গ্লোরিয়াকে ঠিক কোথা থেকে উদ্ধার করার প্রয়োজন হয়েছিল?

কটু তলিয়ে দেখলেই তার আয়ের মধ্যে এর উত্তর পাওয়া যেতে পারে। নাইট ক্লাবে অল্পবয়সি কিশোরী চিত্তবিনোদনকারী হিসেবে সে এক রাতে আয় করত ১০ ডলার, যেখানে ১৯৪৬ সালে এক ঘণ্টায় সর্বনিম্ন মজুরি ছিল ৪০ সেন্ট। ধরে নিচ্ছি, ১৩ বছর বয়সে সে এক রাতে চার ঘণ্টা কাজ করত। সেক্ষেত্রে প্রতি ঘণ্টায় তার আয় হতো ২.৫০ ডলার। টলেডোর একটি নাইট ক্লাবে কাজ করা একজন অল্পবয়সি আনাড়ি কিশোরীর পক্ষে এই উপার্জন খানিকটা অস্বাভাবিক নয় কি? মায়ের মানসিক অসুস্থতা ও অর্থনৈতিক অনিরাপত্তার কারণে কি তাহলে শিশু পতিতাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল গ্লোরিয়া? প্রশ্নটা হয়তো অপবাদসূচক, কিন্তু উপরিউক্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন অবশ্যই যৌক্তিক।

সম্ভবত আমরা কখনোই এই প্রশ্নের উত্তর জানতে পারব না। তবে এটাই হয়তো আসল ঘটনা হয় এবং তার বড়ো বোন সুসান এ বিষয়ে অবগত হয়, তাহলে সুসান কীভাবে তার পিতাকে টলেডোয় ফিরে এসে মানসিকভাবে অসুস্থ সাবেক স্ত্রীর দেখাশোনায় রাজি করিয়েছিল—তার একটা সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়।

গ্লোরিয়া তার বড়ো বোনের সাথে ওয়াশিংটন ডিসিতে চলে যায়। সেখানে 'ওয়েস্টার্ন হাই' থেকে ১২১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে স্নাতক পরীক্ষায় ৪৭তম স্থান অধিকার করে। এরপর সে স্মিথ কলেজে ভর্তি হয় এবং কলেজে পড়াকালীন জুনিয়র বর্ষ সে জেনেভাতে এবং অক্সফোর্ডে এক গ্রীষ্ম কাটিয়ে আসে। ১৯৫৬ সাল ছিল গ্লোরিয়ার জন্য ব্যস্ততম বছর। স্মিথ কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করার পর সে লন্ডনে গর্ভপাত ঘটায় এবং ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সালে চেস্টার বাউলস এশিয়ান ফেলোশিপ অর্জন করে। ফেলোশিপের অধীনে তাকে ভারতে পাঠানো হয়। ভারতে থাকাকালে তিনি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় *দ্যা ১০০০ ইন্ডিয়ান্স* শীর্ষক একটি গাইড বই প্রকাশ করেন।

১৯৫৮ সালে গ্লোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এলে সিআইএ তাকে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ সার্ভিস'-এর পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়। এই সংস্থাটি ছিল সম্পূর্ণভাবে সিআইএ দ্বারা অর্থায়িত ও নিয়ন্ত্রিত। একজন ছদ্মবেশী সিআইএ প্রতিনিধি হিসেবে গ্লোরিয়া স্বাধীন গবেষণার জন্য শতাধিক সদস্য সংগ্রহ করে। পরবর্তী সময়ে তারা সিআইএর নির্দেশনায় ১৯৫৯ সালে ভিয়েনায় ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ ফেস্টিভাল এবং ১৯৬২ সালে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত ইয়ুথ ফেস্টিভালে যোগ দেয়।

১৯৬৭ সালে *র‍্যামপার্টস* ম্যাগাজিনে তার সিআইএর সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। এর আগপর্যন্ত তার সিআইএ সংশ্লিষ্টতা কেউই জানত না। বিষয়টি জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর *ওয়াশিংটন পোস্ট*, *নিউইয়র্ক টাইমস* এবং টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে গ্লোরিয়া নিজেই সংবাদটি নিশ্চিত করে। প্রতিটি সাক্ষাৎকারে সে সিআইএর কাছ থেকে কেবল আর্থিক অনুদান গ্রহণ করার কথা স্বীকার করে এবং দাবি করে, এর বিনিময়ে কিছুই চায়নি তারা! অবাক করা বিষয় হলো—প্রত্যেকে ভেবেছিল তার কথাই সঠিক। কে জানে, হয়তো মানুষ বিশ্বাস করেছিল। কারণ, সিআইএ হরহামেশা নারীদের ইউরোপে যেতে টাকা-পয়সা বিলিয়ে বেড়াত সেজন্য! ১৯৭০ সালে গ্লোরিয়ার সিআই সংশ্লিষ্টতা নিয়ে অনেক তথ্য সামনে আসে, যা তার ১৯৬৭

সালে দেওয়া প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের সাথে বহুলাংশে সাংঘর্ষিক। মজার ব্যাপার হলো, তার বিপক্ষে সমালোচনাটা প্রতিপক্ষ 'নারীবিদ্বেষী কাল্পনিক পুরুষতন্ত্রের' দিক থেকে নয়, এসেছিল নারীবাদী আন্দোলনের ভেতর থেকেই।

যুক্তরাষ্ট্রে গঠিত দ্বিতীয় ধাপের চরমপন্থি ফেমিনিস্ট সংগঠনের অন্যতম একটি রেডস্টোকিংস। তারাও গ্লোরিয়াকে নিয়ে নিন্দামূলক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠানটি তার স্বাধীন শক্তিশালী নারীত্ব এবং প্রভূত সম্পত্তি নিয়েও প্রশ্ন তোলে। রেডস্টকিংসের সেই প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছিল নারী ম্যাগাজিন *অফ আওয়ার ব্যাকস*-এর ১৯৭৫ সালের জুলাই সংস্করণে, ঈষৎ পরিমার্জিতরূপে। ম্যাগাজিনের সম্পাদকমণ্ডলী বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশের পূর্বে এক মাস আটকে রেখেছিল। এই পুরো সময় ধরে তারা বিষয়টি অধিকতর যাচাই-বাছাই করেছে। এত বড়ো একজন নারীবাদী কর্মীর বিপক্ষে অভিযোগ প্রকাশের পূর্বে গবেষণায় কোনোরূপ ত্রুটি রাখতে চায়নি তারা।

১৯৭০-এর দশকেও গ্লোরিয়া অত্যন্ত ক্ষমতাশীল নারী ছিলেন। তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামা চাট্টিখানি কথা নয়। এত প্রভাবশালী নারী থাকা সত্ত্বেও ফেমিনিস্টদের দাবি, সে সময় বেশির ভাগ নারীই নাকি ছিলেন কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক! কিন্তু গ্লোরিয়ার সাথে রেডস্টকিংসের সমস্যা কী ছিল? ১৯৬৭ সালের সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ সার্ভিসের বাস্তবতাই-বা কতটুকু?

সিআইএর পৃষ্ঠপোষকতায় ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ ফেস্টিভালে গ্লোরিয়ার উপস্থিতি নিয়ে রেডস্টোকিংস উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছিল। তারা খুঁজে বের করে যে, গ্লোরিয়ার সংস্থাটি সেই উৎসবে উপস্থিত অনেকের ওপর নিখুঁত ডকুমেন্টস তৈরি করেছে। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, গ্লোরিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ সার্ভিস ছিল সেই উৎসবের সোচ্চার সমালোচক। ১৯৬২ সালের উৎসবকে কেন্দ্র করে টানা চার রাতের গন্ডগোলে ৪০ জনকে গ্রেফতার হয়। এই গন্ডগোলের জন্য সিআইএকে দায়ী করে রাশিয়ার পত্রিকা *প্রাভাদা*। রেডস্টকিংসের দাবি—এসব তথ্য-উপাত্ত প্রমাণ করে গ্লোরিয়া যে সিআইএ থেকে কেবল 'বিনাস্বার্থ' অর্থ পাচ্ছিল তা নয়; বরং সে ছিল সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত কুচক্রী। গ্লোরিয়া তার ১৯৬৭ সালের সাক্ষাৎকারে এই দাবিটি কার্যত স্বীকার করে নেয়।

এ ছাড়াও ১৯৬২ সালে গ্লোরিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ সার্ভিস পরিত্যাগ করার দাবিকে রেডস্টোকিংস প্রত্যাখ্যান করে। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর তারা আবিষ্কার করে, অন্তত ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ সার্ভিসের পরিচালনা

পর্ষদের সদস্য ছিল গ্লোরিয়া। *হুজ হু ইন আমেরিকা* তাদের ১৯৬৮-১৯৬৯ সংস্করণে লেখে—

> 'পরিচালক—এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ সার্ভিস, ক্যামব্রিজ, ম্যাস, নিউইয়র্ক সিটি, ১৯৫৯-১৯৬২, বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, ওয়াশিংটন।'

বিষয়টি ফাঁস হওয়ার পর গ্লোরিয়া দাবি করে, এটা সম্পূর্ণভাবেই হুজ হু কর্তৃপক্ষের ভুল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হুজ হু স্টেইমেনের ব্যাপারে প্রদত্ত তথ্য সম্পর্কে কোনো প্রত্যাহার বা সংশোধনী জারি করেনি।

রেডস্টোকিংস গ্লোরিয়ার গোটা জীবন পর্যালোচনা করার প্রচেষ্টা চালায়। তার ভারতে কাটানো সময়টুকু নিয়ে শুরু হয় পুঙ্খনাপুঙ্খ তদন্ত। তারা আবিষ্কার করে, ভারতে তাকে দুই বছর যাওয়া-আসার বিমানভাড়াসহ অনুদান দেওয়া চেস্টার বাউলস এশিয়ান ফেলোশিপ বলতে মূলত কিছুই ছিল না! হ্যাঁ, এটাই সত্যি। গ্লোরিয়াই বিশ্বের ইতিহাসে একমাত্র ব্যক্তি; যার উক্ত ফেলোশিপপ্রাপ্তির দলিল রয়েছে। তার পূর্বে বা পরে আর কেউই এটা পায়নি। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে অনেক চেষ্টার পরেও চেস্টার বাউল ফেলোশিপের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছি। বিশ্বাস করুন বা না করুন, চেস্টার বাউল মোটেই প্রচলিত কোনো নাম নয়। সবশেষে এই নামে যাকে খুঁজে পেয়েছি, তিনি একজন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত ভারত ও নেপাল উভয় দেশে চেস্টারকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান। চেস্টার পরবর্তী সময়ে মার্কিন কংগ্রেসম্যান এবং এরপর পুনরায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যেহেতু কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের প্রায়ই গুপ্তচর হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং একই সঙ্গে চেস্টারের নামানুসারে কোনো সংঘের অস্তিত্বও প্রমাণিত নয়, ফলে রেডস্টোকিংস বিশ্বাস করে নেয়—চেস্টার বাউল এশিয়ান ফেলোশিপের ধারণাটি মূলত সিআইএর অনুদানের বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তৈরি করা নাটক মাত্র।

এ ছাড়াও গ্লোরিয়ার লেখা ভ্রমণ গাইড বই *দ্যা ১০০০ ইন্ডিয়ানস* সম্পর্কে রেডস্টোকিংস যাচাই-বাছাই করার চেষ্টা চালায়। এই বইয়ের রচয়িতা গ্লোরিয়া কি না তা যাচাই করতে গিয়ে রেডস্টোকিংস যে কোনো তথ্য পায়নি শুধু তা নয়; এই নামে কোনো বই কখনো প্রকাশিত হওয়ার প্রমাণও তারা খুঁজে পায়নি।

উপরন্তু রেডস্টোকিংসের অনুসন্ধানের সত্যতা যাচাই করছিল অফ আওয়ার ব্যাকস-এর সম্পাদক প্যানেল। তারা শিকাগো ট্রিবিউনের একটি কলাম খুঁজে পান, যেখানে গ্লোরিয়া বলেছিল—ভারত সম্পর্কে তার বইটি প্রকাশ করেছে 'এয়ার ইন্ডিয়া' নামক একটি আকাশযান প্রতিষ্ঠান। সম্পাদকমণ্ডলী এয়ার ইন্ডিয়া ও ভারতীয় দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারে, তাদের কেউ এই বইয়ের কথা জীবনে শোনেনি! আমি নিজেও গ্লোরিয়ার দ্যা ১০০০ ইন্ডিয়ানস বইটি খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছি।

এখন আমরা আরেক জাঁদরেল ফেমিনিস্ট ক্লে ফেলকারের তৎপরতায় দৃষ্টি রাখব। ক্লে ১৯৫১ সালে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন এবং গার্ডিয়ান-এর ২০০৮ সালের ২৮ জুলাই সংস্করণের খবর অনুযায়ী ১৯৮০ সালে তিনি এসকুইয়ারের ফিচার সম্পাদক ছিলেন। রেডস্টোকিংস উদ্ঘাটন করে যে, গ্লোরিয়া কর্তৃক পরিচালিত এবং সিআইএ অর্থায়িত সংস্থা ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ সার্ভিসের (IRC) অংশ হিসেবে ক্লে ১৯৬২ সালে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত গ্রীষ্মকালীন ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ ফেস্টিভালে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে সময় তিনি ছিলেন আই.আর.সি প্রকাশিত সংবাদপত্রের সম্পাদক, ইয়ুথ ফেস্টিভাল চলাকালে যেটি প্রতিদিন প্রকাশিত হতো।

এ বিষয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হলে সিআইএর সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি ক্লে অস্বীকার করেন। সিআইএ অর্থায়িত সংবাদপত্রের একজন সম্পাদকের এমন জবানি অত্যন্ত হাস্যকর। ইতিহাসের এই দীর্ঘ পাদটীকা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

হেলসিংকি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬২ সালের গ্রীষ্মকালে। সিআইএ ট্রিপ থেকে ফিরে আসার পরপরই গ্লোরিয়া ক্লে ফেলকারকে প্ররোচিত করেন, যেন এসকুইয়ারের ফ্রিল্যান্স লেখিকা হিসেবে তাকে নিয়োগ দেয়। ক্লে তখনও এটির সম্পাদক ছিলেন। গ্লোরিয়ার মূল অনুচ্ছেদটি এত জঘন্য হয়েছিল যে, সম্পাদক তাকে সেটা পুনরায় লিখতে বাধ্য করেন। এরপর তার অনুচ্ছেদ The Moral Disarmament of Betty Coed এসকুইয়ারের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় শুধু প্রকাশিতই হয়নি; বরং একে 'এডিটরস ফেভারিট' হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন ফেলকার; অথচ এটা ছিল গ্লোরিয়ার প্রথম কলাম। একজন অচেনা লেখকের পক্ষে এসকুইয়ারে প্রকাশিত প্রথম লেখার জন্য এমন ভূয়সী প্রশংসা পাওয়াটা বেশ সন্দেহজনক। স্পষ্ট করে বলতে গেলে—লেখালিখির জন্য ক্লে শুধু গ্লোরিয়াকে একটি জুতসই প্ল্যাটফর্মই দেয়নি; বরং যেকোনো লেখকের চেয়ে তার প্রতি সম্পাদকমণ্ডলীর জোরালো সমর্থনও আদায় করে দিয়েছিলেন তিনি।

হেলসিংকিতে যা-ই ঘটুক না কেন, এটা পরিষ্কার যে, ফেলকারকে বশে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন গ্লোরিয়া।

গ্লোরিয়ার কলাম প্রকাশিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ফেলকার এসকুইয়ার ত্যাগ করেন। গ্লোরিয়া ফিরে যান তার কৈশোরের নাইট ক্লাবে। এরপর তিনি নিউইয়র্ক প্লেবয় ক্লাবে অতীব যৌন আবেদনময়ী চিত্তবিনোদিনী হিসেবে নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন লেখালিখিতে নিজের কাজকে তিনি অভিহিত করেন 'গুপ্ত সাংবাদিকতা' বলে। *শো ম্যাগাজিন*-এ গ্লোরিয়ার ফ্রিল্যান্স কলামটি প্রকাশিত হলে তার সাংবাদিকতা ক্যারিয়ার বেসামাল হয়ে পড়ে। রাতারাতি তিনি নিয়োগ অযোগ্য হয়ে যান। কেননা, সেই কলামে তিনি লিখেছিলেন– 'আমি এখন একজন যৌন আবেদনময়ী নারীতে পরিণত হয়েছি।'

সে সময় তাকে নিজের নতুন প্রতিষ্ঠিত *নিউইয়র্ক ম্যাগাজিন*-এর কাজ করার সুযোগ দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই বাঁচিয়েছিল ফেলকার। সেবার অবশ্য ফেলকার তাকে নিছক ফ্রিল্যান্স লেখিকার পরিবর্তে ফুল টাইম কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করে।

১৯৭২ সালে গ্লোরিয়া ও ফেলকার *মিসেস* ম্যাগাজিন প্রকাশ করে। ম্যাগাজিনটির ৪০ পৃষ্ঠার প্রথম সংস্করণ ছিল *নিউইয়র্ক ম্যাগাজিন*-এর সফলতম সংখ্যা। এভাবে গ্লোরিয়া *নিউইয়র্ক ম্যাগাজিন*-এ প্রতিষ্ঠিত সাফল্য, খ্যাতি এবং ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের সুবিধা ভোগ করেন। যদিও এই ম্যাগাজিনের সাথে ফেলকারের জড়িত থাকার বিষয়টি জনসম্মুখে গোপন রাখা হয়েছিল। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে, ফেলকার পুরোপুরিভাবে অর্থায়ন না করলে *মিসেস* ম্যাগাজিন কখনোই প্রকাশিত হতো না। তিনি প্রকাশনা এবং বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলোর বৃহৎ নেটওয়ার্কগুলোতে গ্লোরিয়াকে অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ফেলকার যে এই প্রকল্পে কেবল পূর্ণাঙ্গ অর্থায়ন করেছেন তা-ই নয়, শুরু থেকে শেষাব্দি এর তদারকিও করেছেন সাগ্রহে।

ফেলকারের *নিউইয়র্ক ম্যাগাজিন*-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্তির ফলে স্টেইনেমের *মিসেস* ম্যাগাজিন ২৬,০০০ সাবস্ক্রিপশন পেয়ে যায়। উদ্ভট হলেও সত্য– বিনিয়োগের ১০০ শতাংশ ফেলকার প্রদান করলেও মালিকানার কোনো অংশেরই ভাগ নেননি তিনি। ব্যাপারটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। কেননা, প্রথম সংখ্যাতেই বিপুল সাবস্ক্রিপশনের ফলে বোঝা গিয়েছিল, একসময় তুমুল জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এই ম্যাগাজিন।

মিসেস ম্যাগাজিন-এর আরেকটি অদ্ভুত বিষয় হলো—ফেলকার এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করার পর ওয়ার্নার কমিউনিকেশন বিপুল অর্থের জোগান নিয়ে এগিয়ে আসে। *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর প্রতিবেদক গেরাল্ডিন ফ্যাব্রিকান্ট ১৯৮৭ সালের এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করেন—ওয়ার্নার কমিউনিকেশন এক মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে ম্যাগাজিনটিতে অর্থায়ন করেছিল। ওয়ার্নার সমস্ত অর্থের জোগান দিলেও তার মালিকানা ছিল মাত্র ২৫%। ওয়ার্নার কমিউনিকেশনের এই কাজ ব্যাবসায়িক ক্ষেত্রে পুরোপুরি অযৌক্তিক। এটা আপনাকে জিজ্ঞাসু করে তুলবে যে, ফেলকার ঠিক কী কারণে গ্লোরিয়ার পুরো ক্যারিয়ারজুড়ে সাহায্য করেছেন? জাতীয় পর্যায়ে গ্লোরিয়ার সাফল্য প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময় তাকে অর্থ ও সমর্থন দিয়ে গেছেন তিনি। ফেলকার না থাকলে এতটা প্রভাবশালী অবস্থানে আসাটা গ্লোরিয়ার জন্য ছিল অসম্ভব। এসব তথ্য উদ্‌ঘাটন করে উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছিল রেডস্টোকিংস। সবার কাছে এটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, গ্লোরিয়ার নিজের অর্জিত বলে দাবি করা প্রতিটি মাইলফলক সিআইএ ও বিত্তশালী নারীভোগী ক্লে ফেলকারের অবদান।

রেডস্টোকিংস তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশ করার পরে কী হয়েছিল?

ভিলেজ ভয়েস সংবাদপত্রের প্রতিবেদক ন্যান্সি বোরম্যান ১৯৭৯ সালের ২১ মে পুরো ঘটনাটি তার কলাম 'ইনসাইড দ্যা সিআইএ উইথ গ্লোরিয়া গ্লোরিয়া'-এ প্রকাশ করেন। তিনি প্রতিবেদন পেশ করেন—রেডস্টকিংসের *Feminist Revolution* নামক স্বপ্রকাশিত একটি বইয়ে সিআইএ সংযোগ নিয়ে পুরো একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। রেডস্টোকিংস এটি ছাপায় এবং ৬০০ কপির সব কটিই বিক্রি করে; এমনকি বইয়ের আরও কপি ছাপানোর জন্য তারা যোগাযোগ করে র‍্যান্ডম হাউজ প্রকাশনীর সাথে। র‍্যান্ডম হাউজের আইন পর্ষদ বিস্তারিত নিরীক্ষণের পর বইটির ২০,০০০ কপি প্রকাশ করতে সম্মত হয়। এর কিছুদিন পরে গ্লোরিয়া নিজেই তার আইনজীবীর পক্ষ থেকে একটি চিঠি নিয়ে র‍্যান্ডম হাউজে যান। বস্তুত এটা ছিল সিআইএর অধ্যায়টি বই থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য লিখিত হুমকি। কয়েক সপ্তাহ পর বিত্তবান নারীভোগী ক্লে ফেলকার, দ্যা উইমেনস অ্যাকশন অ্যালায়েন্স, ওয়ার্নার কমিউনিকেশন্স, ফ্রাংকলিন থমাস, নারী ভোটার লিগের বৈদেশিক ফান্ড এবং ক্যাথারিন গ্রাহাম—প্রত্যেকেই র‍্যান্ডম হাউজের বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি দেয়। মজার বিষয় হলো—যারা মামলার হুমকি দিয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই ছিল গ্লোরিয়ার পৃষ্ঠপোষক কিংবা সিআইএর বিশ্বস্ত বন্ধু।

এই চতুর্মুখী প্রতিবন্ধকতার কারণে বইটি প্রকাশিত হতে আরও তিন বছর সময় লাগে এবং ১৩,০০০ অগ্রিম অর্ডার পাওয়া সত্ত্বেও মাত্র ১২,৫০০ কপি প্রকাশ করে র‍্যান্ডম হাউজ। ততদিনে গ্লোরিয়ার সিআইএ সংযোগের চ্যাপ্টারটি বই থেকে উধাও হয়ে যায়। রেডস্টোকিংস ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে। র‍্যান্ডম হাউজের অন্যায্য সেন্সরশিপের নিন্দা জানিয়ে তারা একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সেখানে ১৮ পৃষ্ঠার একটি জবাবনামা প্রকাশ করে তারা। অনুসন্ধানের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আপত্তি ওঠার পর রেডস্টকিংসে তাদের দাবির পক্ষে বিশদ দলিলাদি প্রদর্শন করে। বোরম্যানের ভাষ্যমতে, এই বিষয়ে রীতিমতো 'ব্ল্যাকআউট' করেছিল সবগুলো মিডিয়া।

এই বই লেখার সময় *ভিলেজ ভয়েস* অনলাইনে তাদের পূর্বতন সংস্করণ প্রকাশ করেছে। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো—সেখানে ১৯৭৯ সালের মে মাসের বোরম্যানের অনুচ্ছেদটি অনুপস্থিত। *Blacklisted News, Secret History from Chicago 1969 to 1984* বইটি নিয়ে আলোচনা করে এমন একটি ওয়েবসাইটে আমি এটার অনলাইন ভার্সন খুঁজে পেতে সমর্থ হয়েছিলাম, যেখানে বোরম্যানের পুরো অনুচ্ছেদটিই ছিল। স্পষ্টতই গ্লোরিয়ার সিআইএ সংযুক্তি থাকার ব্যাপারে প্রায় সব মিডিয়ার ব্ল্যাকআউট নিয়ে বোরম্যান ১৯৭৯ সালে যে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, তা আজও একই রকম সত্য।

গ্লোরিয়ার পুরো ক্যারিয়ার এবং পরিচয় মূলত অন্যদের অর্থায়নে একরাশ মিথ্যে দিয়ে গড়া। এসব অবগত হওয়ার পর এটা শুনে বেশ কৌতুকবোধ হয় যে, ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব ওমেন এমা সুলকোইচিজকে 'সাহসিকতার' জন্য পুরস্কৃত করেছে। কে এই এমা সুলকোইচিজ? রেকর্ড সাক্ষ্য দিচ্ছে, এই তথাকথিত সাহসী নারী ছিলেন মিথ্যা ধর্ষণের মামলাকারী হিসেবে আত্মস্বীকৃত ধোঁকাবাজ এবং ঘাঘু প্রতারক। পাঠকের সুবিধার্থে এও জানিয়ে রাখি, ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব ওমেনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গ্লোরিয়া। মিথ্যাবাদীরা বোধ হয় এভাবেই একজোট হয়।

আপনি আধুনিক বিত্তবান নারীবাদীদের লক্ষ করলে দেখবেন, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই সাফল্য নিশ্চিতকরণে সুগার ড্যাডি কিংবা কর্পোরেট দাতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্রমবর্ধমান সফলতার সাথে সাথে অবশ্য এই ধরনের নারীভোগী এবং কর্পোরেটদের সহায়তার স্বীকারোক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে।

পিতৃতন্ত্র

পিতৃতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে এর পরিচয় জেনে নেওয়া উচিত। *মেরিয়াম ওয়েবস্টার*-এ পিতৃতন্ত্র সম্পর্কে বলছে—

> 'এমন সামাজিক কাঠামো, যেখানে বংশ বা পরিবারে পিতার আধিপত্য থাকে, স্ত্রী ও সন্তানরা আইনিভাবে পিতার ওপর নির্ভরশীল এবং পিতৃগোত্র থেকে বংশ ও উত্তরাধিকার গণনা করা হয়।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বিশ্ব কার্যত পিতৃতান্ত্রিক নীতি দ্বারাই পরিচালিত হতো। তবে সেই সময়ের সাংস্কৃতিক রীতি অনুযায়ী বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটা ছিল সীমিত বা সফট প্যাট্রিয়ার্কি। নারীদের নিয়ন্ত্রণ বা নিপীড়ন করার ইচ্ছা থেকে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কোনো শক্তিশালী সরকার কখনো বলে-কয়ে নারীদের নিপীড়নের উদ্দেশ্যে ক্ষমতায় আসেনি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি সফট প্যাট্রিয়ার্ক রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে ১৯৬৩ সালে সমান বেতন অধিকার আইনে স্বাক্ষর করেন। উক্ত আইন অনুযায়ী সমান অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও একই কাজ সম্পাদনকারী কর্মজীবী নারী-পুরুষ উভয়ের বেতন হবে সর্বাংশে সমান। এরও ৪৩ বছর পূর্বে ভোটাধিকার লাভ করেছিল আমেরিকান নারীরা।

১৮৮০ সালে মেরি গেজ শুধু নারীদের জন্য আলাদা একটি স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৯ সালে টেনেসির ক্লার্কসভিলে প্রতিষ্ঠিত হয় নারীদের জন্য প্রথম ব্যাংক First Womans Bank of Tennesse। যদিও ব্যাংকটির সমস্ত শেয়ারহোল্ডার পুরুষ ছিলেন, তবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় ছিলেন নারীরাই।

ফেমিনিস্ট আন্দোলন বিখ্যাত হওয়ার পর তাদের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় বিবাহ ও পারিবারিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে লড়াই। বিখ্যাত নারীবাদী লেখিকা ও প্রভাষক লিন্ডা গর্ডন এতদূর পর্যন্ত বলেছেন—'একক পরিবারব্যবস্থা অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে। এর চূড়ান্ত মর্মার্থ যা-ই হোক না কেন, পারিবারিক বিচ্ছেদ বর্তমানে একটি বাস্তব বৈপ্লবিক পদ্ধতি। বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ দায়িত্বপালন করতে গিয়ে কোনো নারীরই উচিত নয়—নিজের কোনো রকম সুযোগ-সুবিধা ক্ষতিগ্রস্ত করা।'

আরেকজন লেখিকা ভিভিয়ান গর্নিকের ভাষ্যমতে—'গৃহিণী একটি অবৈধ পেশা!'

পশ্চিমা বিশ্বের ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব ওমেনের নেতা শিলা ক্রোনিন বলেন—'বিয়ে যেহেতু নারীদের দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে, তাই অবশ্যই নারীবাদী আন্দোলনে একে ধ্বংস করতে হবে।'

এগুলো হলো বিবাহ ও পারিবারিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে নারীবাদীদের ধারাবাহিক যুদ্ধের অল্প কিছু উদাহরণ। অল্প কয়েক দশকের মধ্যেই ফেমিনিস্ট আন্দোলন তাদের এই উদ্দেশ্য সাধনে অনেকাংশে সফল হয়েছে। CDC/NCHS National Vital Statistics System-এর ২০১৪ সালের তথ্যমতে— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০০০ জনে বিয়ের হার মাত্র ৬.৯%। তাতে আবার বিবাহবিচ্ছেদের হার ৩.২ শতাংশ। আরও লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, বিবাহবিচ্ছেদের হার প্রতিটি ধারাবাহিক বিয়ের সাথে বৃদ্ধি পায়; দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় ৬০% এবং তৃতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে প্রায় ৭৩%।

সায়েন্স ডেইলি ২০১৫ সালের ২২ আগস্ট একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে। নিবন্ধটি রচিত হয়েছিল স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক মাইকেল রোজেনফেল্ডের 'How Couples meet and Stay Together' নামক একটি গবেষণার ওপর ভিত্তি করে। সেই গবেষণায় রোজেনফেল্ড বিস্তর তথ্য-উপাত্তের সাহায্যে দেখান, ৬৯% ক্ষেত্রে বিবাহিত দম্পতির বিচ্ছেদ হয়ে থাকে স্ত্রীর পক্ষ থেকে। এই সামাজিক ভাঙনের পেছনে নারীবাদীদের দায় সন্দেহাতীত ও সুপ্রমাণিত।

১৯৯৫ সালের ১৭ মার্চ হেরিটেজ ফাউন্ডেশন প্যাট্রিক এফ ফ্যাগানের 'The Real Root Causes of Violent Crime: The Breakdown of Marriage, Family and Community' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ফ্যাগানের গবেষণার সারাংশ—'স্কলারদের প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে আমেরিকাতে অপরাধ

ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ হলো—মা-বাবাদের সন্তান প্রতিপালনে চূড়ান্ত অনীহা। বৃহত্তর পরিসরে বিয়ে এবং পরিবারের অভ্যন্তরীণ ভালোবাসাহীনতা এবং শিশুদের লালন-পালন ব্যাহত হওয়ার ফলে আমেরিকাকে বড়ো ধরনের সামাজিক মূল্য চুকাতে হয়েছে।'

ফ্যাগানের মূল গবেষণাটি বিয়ে এবং পারিবারিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে নারীবাদী লড়াইয়ের সামাজিক পরিণতি তুলে ধরেছে। প্রতিবেদনের সারাংশে এই সামাজিক অবক্ষয়গুলো খুব সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে—'গত ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে বাবাদের পরিত্যাজ্য পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সহিংস অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেসব অঞ্চলে পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত পরিবারের সংখ্যা বেশি, সেগুলোতে অপরাধ সংঘটনের হারও অনেক বেশি। হেরিটেজ স্কলাররা রাজ্যগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে গবেষণা করেছেন।

তাদের ভাষ্যমতে—বিচ্ছেদের ফলে সিঙ্গেল প্যারেন্টসের নিকট বসবাসকারী শিশুদের হার ১০% বৃদ্ধি পেলে কিশোর অপরাধের সংখ্যা বেড়ে যায় ১৭%। পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সহিংস কিশোর অপরাধের হার বৃদ্ধি পায়। পাঁচ বা ছয় বছর বয়সে শিশুদের অস্বাভাবিক আচরণ বা শত্রুতা মূলত ভবিষ্যৎ অপরাধীর পূর্বাভাস। হবু অপরাধীরা অনেক ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণিতে থাকতেই অন্য শিশুদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়, সে নিজের আলাদা বন্ধুমহল গড়ে তোলে; ভবিষ্যতে যা পরিণত হয় অপরাধী গ্যাং-এ।'

উক্ত প্রতিবেদনটি কেবল পরিবারে অনুপস্থিত পিতাদের সামাজিক প্রভাবই পর্যবেক্ষণ করেনি; পারিবারিক ভালোবাসার বন্ধন অটুট আছে—এমন পরিবারও পর্যবেক্ষণ করেছে। বিবাহবন্ধন অটুট আছে এবং পারিবারিক মূল্যবোধের চর্চা হয় এমন পরিবারের উল্লেখ করে সেখানে বলা হয়েছে—

'বেশ ভালো পর্যায়ে ধর্মীয় অনুশাসন চর্চাকারী অঞ্চলগুলোতে উচ্চমাত্রার অপরাধ সংঘটিত হয় না; এমনকি উচ্চমাত্রার অপরাধ সংঘটিত হওয়া অভ্যন্তরীণ শহরগুলোর আশেপাশে অবস্থিত নিরাপদ ও স্থিতিশীল পরিবারের ৯০ শতাংশের অধিক শিশু অপরাধী হয় না। এর বিপরীতে এই অঞ্চলগুলোর অনিরাপদ ও অস্থিতিশীল পরিবারের মাত্র ১০ শতাংশ শিশু অপরাধ এড়াতে সক্ষম হয়! বিবাহ বজায় রাখতে সক্ষম, এমন অপরাধীরা বিয়ের পর ধীরে ধীরে অপরাধের জীবন থেকে দূরে সরে যায়। সন্তানের সাথে মায়ের স্নেহপূর্ণ ভালোবাসা সন্তানের অপরাধী জীবনের বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। পিতার

কর্তৃত্ব এবং সন্তানদের লালন-পালনের সাথে জড়িত থাকাও শিশুদের অপরাধ জীবনের বিরুদ্ধে অসাধারণ একটি রক্ষাকবচ।'

বিয়ে নির্মূলের মতো নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছে—এমন সমাজের সাথে যদি ঐতিহ্য এবং পারিবারিক মূল্যবোধ বিদ্যমান থাকা সম্প্রদায়ের তুলনা করা হয়, তবে উভয়ের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিবেদনটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, উচ্চমাত্রার আঞ্চলিক অপরাধের সর্ববৃহৎ কারণ হচ্ছে পিতৃহীন পরিবার। অন্য কথায়, বাবা-মা বিচ্ছিন্ন ভগ্ন পরিবারগুলোই সমাজে অপরাধের হার বৃদ্ধির জন্য সরাসরি দায়ী। এটা নির্মম হলেও সত্য যে, পরিবার এবং বিবাহ সম্পর্কে ফেমিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি শিশু ও সমাজ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। কারণ, বিয়ের বিরুদ্ধে নারীবাদের লড়াই মূলত পিতৃহীন পরিবারের দিকে যাত্রা।

প্রায় ২০ বছর পর রবার্ট আই লারম্যান এবং উইলিয়াম ব্রাডফোর্ড উইলকক্স আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের জন্য ডক্টর ফ্যাগানের ১৯৯৫ সালের গবেষণাকে অনুমোদন করেন। তাদের কাজ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়—সমাজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৪ সালের অক্টোবরে তারা যৌথভাবে 'For Richer, For Poorer, How Family Structures Economic Success in America' নামে একটি ৫৬ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন তৈরি করেন। প্রতিবেদনটি তৈরি হয়েছিল পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সমন্বয়ে।

১. স্বল্প আয়ের আমেরিকানদের মধ্যে বিবাহ থেকে পালানোর প্রবণতা বেশি। এটি আমেরিকার পারিবারিক জীবনে অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল নিয়ামক। আমরা অনুমান করি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ১৯৮০ সালের বিবাহিত দম্পতিদের মতো বর্তমানে বিবাহিত জীবন উপভোগ করত, তাহলে শিশুসহ তাদের পরিবারের আয় হতো কমপক্ষে ৪৪ শতাংশ বেশি। অধিকন্তু, ১৯৭৯ সাল থেকে বাচ্চা রয়েছে এমন পরিবারগুলোর মধ্যে কমপক্ষে ৩২ শতাংশ পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সময়ে পুরুষ-কর্মসংস্থানের হার কমেছে ৩৭ শতাংশ। এই উভয়টির সাথে অটুট দাম্পত্যজীবন বজায় রাখে—এমন আমেরিকানদের সংখ্যা হ্রাসের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

২. পিতা-মাতার সাহচর্য ও তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠার সঙ্গে বর্তমান যুবক-যুবতিদের শিক্ষা, কাজ এবং বেশি উপার্জনের গভীর সংযোগ রয়েছে। পরিবারের তরুণ যুবক-যুবতিরা বাৎসরিক যথাক্রমে ৬৫০০ ডলার থেকে

৪৭০০ ডলার পরিমাণ 'ইনট্যাক্ট ফ্যামিলি ইনকাম প্রিমিয়াম বা অটুট পরিবার পারিতোষিক' পেয়ে থাকে, যেটা তাদের পরিবার বিচ্ছিন্ন বন্ধুদের থেকে অনেক বেশি।

৩. পুরুষেরা যথেষ্ট পরিমাণ 'ম্যারেজ প্রিমিয়াম বা বিবাহ পারিতোষিক' পান এবং নারীদের ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে কোনো বৈবাহিক জরিমানা বহন করতে হয় না। যৌথ পরিবারের সদস্যগণ তাদের সমান যোগ্যতাসম্পন্ন পরিবারহীন ব্যক্তিদের চেয়ে বেশ ভালো পরিমাণ পারিবারিক আয় করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, পুরুষেরা তাদের ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে অবিবাহিত বা ডিভোর্সি সহকর্মীদের তুলনায় প্রতিবছর কমপক্ষে ১৫,৯০০ ডলার বেশি বিবাহ পারিতোষিক উপভোগ করেন।

৪. সরাসরি অর্থের যোগ থাকায় এই দুটি বিষয় একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। বাবা-মা উভয়ের সাথে বেড়ে ওঠা একদিকে যেমন সন্তানের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করে, তেমনি তাদের বিয়ে ও নতুন পরিবার গঠনের সম্ভাবনাও বাড়িয়ে দেয়। আর পরিপূরক শিক্ষা ও বিবাহ মানেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, বেশি বেশি আয়ের সুযোগ। বর্তমানে আমেরিকায় ভগ্ন পরিবারে বড়ো হওয়া লোকদের থেকে অটুট পরিবারের সদস্যদের আয় কমপক্ষে ৪২,০০০ ডলার বেশি।

৫. একটি অটুট পরিবারের সুবিধা গোটা জাতিই উপভোগ করতে পারে। এটা শ্বেতাঙ্গদের ক্ষেত্রে যতখানি প্রযোজ্য, কৃষ্ণাঙ্গ ও হিস্পানিকদের জন্যও ততখানি প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষেরা ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে তাদের অবিবাহিত সহকর্মীদের তুলনায় কমপক্ষে ১২,৫০০ ডলার বেশি লাভ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সুবিধা অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত পুরুষ ও নারীদের বেলায় একই রকম।

বিবাহপ্রথা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট পারিবারিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করার মাধ্যমে নারীবাদীরা আমাদের সমাজকে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মিলো ইয়ান্নোপুলাস যথার্থই বলেছিলেন—'ফেমিনিজম হচ্ছে ক্যান্সার।' নারীবাদীদের অন্ধবিশ্বাস—দুনিয়ার সব পুরুষরা মেল প্রিভিলেজ। সহজ কথায় তাদের বক্তব্য হলো—অনাদিকাল থেকেই পুরুষদের একধরনের বিশেষ অধিকার দেখিয়ে ফায়দা লুটে আসছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! এই বই লেখার সময় পর্যন্ত 'মেল প্রিভিলেজ' শব্দটা কোনো প্রতিষ্ঠিত অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে *আরবান ডিকশনারিতে* শব্দটির একাধিক সংজ্ঞা রয়েছে। হাস্যকরভাবে মেল প্রিভিলেজের সবচেয়ে ভালো সংজ্ঞাটি হচ্ছে—

'এটি হতাশ নারী সমকামী; যাদের চুল তাদের বুদ্ধির চেয়েও ছোটো, তাদের তৈরি করা একটি কাল্পনিক শব্দ। দুনিয়ার সবকিছুর পেছনে অজুহাত হিসেবে তারা এটি ব্যবহার করে থাকে।'

আরবান ডিকশনারির দ্বিতীয় জনপ্রিয় সংজ্ঞাটি হলো—

'রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, গণিত এবং অন্যান্য চাকরিসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা কেন প্রাধান্য পাচ্ছে না, তার অজুহাত হিসেবে ব্যবহারের জন্য মূলত লিবারেল ও প্রগতিশীল ফেমিনিস্টদের মনগড়া ও প্রচারিত একটি মিথ বা কল্পকথা। এই ষড়যন্ত্রতত্ত্ব অনুসারে ধরে নেওয়া হয়, পুরুষরা প্রজাতি হিসেবে আদতে সফল নয়; বরং তারা যা অর্জন করেছে, সবকিছুই সম্ভব হয়েছে শুধু তাদের লিঙ্গের কারণে। মেল প্রিভিলিজের অস্তিত্বে বিশ্বাস করার জন্য একজনকে অবশ্যই এটা স্বীকার করতে হবে যে, পৃথিবী নিয়ন্ত্রিত হয় প্যাট্রিয়ার্কি দ্বারা।'

পুরুষরা কেন নারীদের চেয়ে বেশি সফল—তার অজুহাত হিসেবে যদিও ফেমিনিস্টরা মেল প্রিভিলেজের মিথ ব্যবহার করে, কিন্তু *আরবান ডিকশনারিতে* এই শব্দের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

ফেমিনিস্টদের প্রত্যেকেই নারীর অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার পক্ষে কথা বলে, কিন্তু এসব অধিকারের বিনিময়ে নারীদের ওপর ন্যায্য দায়িত্ব অর্পণ করার প্রসঙ্গ উঠলেই বেঁকে বসে তারা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলিটারি ড্রাফট বা সামরিক পরিকল্পনার দিকে লক্ষ করুন। যদি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের কেউ এই পরিকল্পনায় নিবন্ধন করতে অস্বীকৃতি জানায়, তার ভোটাধিকার তো বটেই, এমনকি কলেজে ভর্তির জন্য আর্থিক অনুদান এবং ঋণ গ্রহণও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে এখনও পর্যন্ত নারীদের সামরিক পরিকল্পনার জন্য নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই। তারা এটি ছাড়াই ভোটে অংশগ্রহণ কিংবা কলেজের জন্য আর্থিক অনুদান গ্রহণ করতে পারবে। নারীবাদীরা যদি পশ্চিমা সমাজের লিঙ্গবৈষম্য নিয়ে এতটাই উদ্‌বিগ্ন থাকেন, তাহলে অসংখ্য গৃহহীন পুরুষদের দুরবস্থাকে উপেক্ষা করছেন কেন?

২০০১ সালের জুলাইয়ে 'National Health Care for the Homeless Council (NHCHC)' দ্বারা প্রকাশিত *হিলিং হ্যান্ডস* নামের একটি ম্যাগাজিন প্রতিবেদন পেশ করে—'পুরুষদের মধ্যে ৭৭ শতাংশ অবিবাহিত গৃহহীন প্রাপ্তবয়স্ক।

এদের ৩৩ শতাংশের সামরিক অভিজ্ঞতা আছে। গৃহহীন পুরুষদের অ্যালকোহল, ড্রাগ বা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণের চেয়েও বেশি। এদের মধ্যে ৭৩ শতাংশই আবার পুরুষ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জরুরি আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করা হয় বলে অবিবাহিত গৃহহীন পুরুষদের দীর্ঘস্থায়ী আশ্রয়হীনতার ঝুঁকি দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

পুরুষেরা কতবার নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গৃহহীন হয়, সে বিষয়ে ধারণা নিতে গৃহহীনদের সাথে কাজ করে—এমন সমাজকর্মীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল *হিলিং হ্যান্ডস*। এর অংশ হিসেবে তারা বাল্টিমোর মেরিল্যান্ডের গৃহহীনদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সভাপতি এবং সিইও জেফ সিঙ্গারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি গৃহহীনদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল সিঙ্গারের। তিনি বলেন—'শীতার্ত ও নোংরা অবস্থায় রাস্তায় জীবনযাপন করতে চেয়েছে কিংবা খাবার ও আশ্রয় সন্ধানে মাথা কুটতে হয়—এমন জীবন স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে, এ রকম কারও সাথে আমার কখনো সাক্ষাৎ হয়নি।'

হিলিং হ্যান্ডস এরপর ১৮-২৪ বছর বয়সি গৃহহীন যুবকদের স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারী এডি বোনিনের সাক্ষাৎকার ছাপায়। এডি সেখানে বলেন—'আমার ক্লায়েন্টদের বেশির ভাগই পুরুষ। বেশির ভাগ যুবকের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে কাজ করে শিশু নির্যাতন। একবার রাস্তায় বসবাস শুরু করার পরে শুধু অর্থ, খাবার ও থাকার আশ্রয়ের বিনিময়ে তারা প্রায়ই সার্ভাইভাল সেক্স বা জীবনধারণের জন্য যৌনকাজে জড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের কোনো বালাই নেই, উভয় লিঙ্গের সাথেই তারা সেক্স করতে বাধ্য হয়।'

মোনা চালাবি *গার্ডিয়ানে* ২০১৩ সালের ৭ মে প্রতিবেদন করেছিলেন—'আবাসন দাতব্য সংস্থা *ক্রিসিসের* অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, ৮৪ শতাংশ অজ্ঞাত গৃহহীন ব্যক্তিই পুরুষ। সর্বশেষ CHAIN-এর পরিসংখ্যান আমাদের জানায়—রাস্তায় ঘুমন্ত ১০ জনের মধ্যে ৯ জনই পুরুষ। Mankind Initiative-এর তথ্যানুযায়ী, ব্রিটেনের আশ্রয়স্থান বা সেফ হাউজগুলোতে ঘরোয়া সহিংসতার শিকার নারীদের ৪০০০ সংরক্ষিত আসনের বিপরীতে পুরুষদের জন্য রয়েছে মাত্র ৩৩টি আসন (যার মধ্যে ১৮টিই শুধু সমকামী পুরুষদের জন্য)।'

যদিও নারীবাদীরা জোরেশোরে দাবি করে যে, তাদের লক্ষ্য লিঙ্গবৈষম্য দূর করা, কিন্তু যখনই পুরুষ আশ্রয়হীনতার কথা আসে, অদ্ভুতভাবে তারা নীরব

হয়ে যায়। তাদের এই পিনপতন নীরবতাই প্রমাণ করে—মূলত তাদের লক্ষ্যবস্তু লিঙ্গসমতা নয়; বরং নারীকেন্দ্রিকতার শ্রেষ্ঠত্ব।

নারীবাদের অভিযোগের পরবর্তী ক্ষেত্র হচ্ছে নারীরা চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। বাহ্যত অভিযোগটি শুনে বেশ যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কিন্তু বাস্তবতা এবং প্রকৃত তথ্য ভিন্ন কথা বলে।

ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও ২০১৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের একজন অর্থনৈতিক এবং জনতাত্ত্বিক গবেষক এবং *Men Without Work*-এর লেখক নিকোলাস এবারস্টাডের সাক্ষাৎকার নেয়। সাক্ষাৎকারটিতে নিকোলাস বলেন—'জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বয়সে ছয়জন পুরুষের মধ্যে একজনের কোনো চাকরি থাকে না। এটা ১৯৪০ সালের অর্থনৈতিক মন্দার চেয়েও মানবেতর পরিস্থিতি!'

ওয়াশিংটন পোস্ট ২০১৬ সালের ২০ জুন 'Why American men are not working?' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে। নিবন্ধটি রচনার সময় জাতীয় বেকারত্বের হার ছিল ৪.৭%। যেহেতু বেকারত্বের হার খুব কম ছিল, *ওয়াশিংটন পোস্ট* লেখে—

> 'একটি পরিসংখ্যান অর্থনীতিবিদদের হতাশ করছে। তা হলো, লেবার ওয়ার্কফোর্স পার্টিসিপেশন রেট নামে পরিচিত জাতীয় শ্রমশক্তি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ডাউনটাউনের পর থেকে চাকরি করছে বা চাকরির সন্ধান করছে—এমন জনসংখ্যার পরিমাণ নেমে এসেছে ৬২.৬ শতাংশে। এটা এমন নিম্নস্তর, যা ১৯৭০-এর পরে আর দেখা যায়নি।'

এক মিনিটের জন্য বিষয়টি চিন্তা করুন। ৬২.৬% কেবল চাকরি করছে এমন লোকের সংখ্যা নয়; বরং এটা চাকরিজীবী ও চাকরিপ্রার্থী উভয়ের সম্মিলিত সংখ্যা। প্রকৃতপক্ষে কাজ করছে এমন লোকের সংখ্যা আরও কম। এটা কি প্রমাণ করছে যে, নারীরা কাজের সন্ধান করতে পারবেন না? উত্তর হলো, না। *ওয়াশিংটন পোস্ট* আরও লেখে—

> 'হোয়াইট হাউজের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদ অনুসন্ধান করে দেখে যে, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে কর্মক্ষম পুরুষদের প্রাইম এজ বা যোগ্যতম সময়ে কাজে অংশগ্রহণের নিম্নহারের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। কেন এত বেশিসংখ্যক আমেরিকান পুরুষ চাকরির ক্ষেত্র থেকে বাদ পড়ছে, সেটা নিয়ে

বিশ্লেষণ করে সিইএ। তারা দেখতে পায়, বহুসংখ্যক নারী কর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়েছে। ১৯৭০ দশকের শেষদিকে নারীদের অংশগ্রহণের হার যেখানে ছিল ৫০%, একুশ শতকের গোড়ার দিকে সেটা দাঁড়িয়েছে ৬০%-এ।'

২০১৭ সালের জানুয়ারিতে পিউ রিসার্চ একটি চিত্রলেখ প্রকাশ করে, যেখানে দেখা যায়—১৯৯৯ সাল থেকে কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের অংশগ্রহণের হার ১৫% কমে গেছে। একই সময়ে নারীদের অংশগ্রহণের হার বেড়েছে ২২%। এখন পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হারের ওপর ভিত্তি করে এটা মনে করার উপায় নেই যে, আমেরিকায় কর্মক্ষেত্রে নারীরা খুব একটা পিছিয়ে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কীভাবে উভয় লিঙ্গের তুলনা করা যায়? National Girls Collaborative Project অনুসারে, ২০১৩ সালে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের স্নাতক ডিগ্রির ৫৭%-ই নারীরা অর্জন করেছেন। ডার্টমাউথ কলেজে ২৪ জুন, ২০১৬ সালে সায়েন্স অ্যালার্ট প্রতিবেদন প্রকাশ করে—এই বছর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে পুরুষদের চেয়ে নারী স্নাতকধারীর সংখ্যা বেশি ছিল।

The National Center for Education Statistics হলো যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের প্রধান ফেডারেল সংস্থা। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাবিভাগ এবং মার্কিন কংগ্রেসনাল ম্যান্ডেটের অধীনে শিক্ষাবিজ্ঞান অনুষদের মধ্যে অবস্থিত। ২০১৬ সালে তারা প্রতিবেদন প্রকাশ করে—কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশির ভাগই ছাত্রী। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে ৮.৮ মিলিয়ন ছাত্রের বিপরীতে প্রায় ১১.৭ মিলিয়ন ছাত্রী অংশগ্রহণ করবে।

চলুন এ বিষয়ে একটু চিন্তা করা যাক। ২০১৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য পুরুষদের চেয়ে ২.৯ মিলিয়ন বেশি নারী প্রার্থী ছিল। পুরুষদের তুলনায় ৩৩% বেশি নারী কলেজে অংশগ্রহণ করছিল। অথচ নারীবাদীদের অভিযোগ, কল্পিত পুরুষতন্ত্র এবং পুরুষদের বিশেষ অধিকার নারীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে প্রধান বাধা। কিন্তু বাস্তব তথ্য-প্রমাণ অনুসারে এটা নারীবাদীদের অন্যতম একটি কল্পকাহিনি মাত্র। লিঙ্গবৈষম্য মূলত কোথায় রয়েছে, সে সম্পর্কে এখন আর সন্দেহ থাকার কথা নয়। শুধু আশ্রয়হীনতার ক্ষেত্র ছাড়া আর কোথায় পুরুষরা সংখ্যাগরিষ্ঠ!

বরং চাকরির ক্ষেত্রে নারীদের তুলনায় পুরুষদের মৃত্যুর সম্ভাবনাও বেশি। অ্যান্ড্রু ন্যাস্টাউট ১৯৯৬ সালের জুনে Census of Fatal Occupational Injuries শিরোনামে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে। সেখানে তিনি লেখেন—

> 'দেশের নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের মধ্যে ৪৬% নারী। তবুও দেশের নারীদের চাকরিসংক্রান্ত মৃত্যুর হার ৮%।'

স্পষ্টতই নারীবাদ পেশাগত মৃত্যুর বৈষম্য বন্ধ করতে পারেনি। যতক্ষণ পর্য পুরুষ হতাহতের সংখ্যা বেশি থাকে, নারীবাদীরা টুঁ শব্দটি করে না। নারীবা মতাদর্শ কীভাবে সিচুয়েশনাল ইথিক্স বা সুবিধাবাদী নৈতিকতার চর্চা করে, এ তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের মৃত্যুহার হ্রাসের চেষ্টা করার বদলে তারা বিষয়টিকে যেন দেখেও না দেখার ভান করে। এটা পুরুষের জীবনের বিনিময়ে নারীকেন্দ্রিকতাবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিবাহ, পুরুষ ও পারিবারিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে নারীবাদের এসব লড়াই এবং পুরুষবিদ্বেষের কুফল সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় আত্মহত্যার পরিসংখ্যানে। কয়েক দশক ধরে দেখা যাচ্ছে, নারীদের চেয়ে পুরুষরা অধিকহারে আত্মহত্যা করছে। কেন নারীদের চেয়ে পুরুষের আত্মহত্যা করার সম্ভাবনা বেশি?

ডক্টর সুসান জে ব্লুমেন্টাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চারজন রাষ্ট্রপতির প্রশাসনে ফেডারেল সরকারের শীর্ষস্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হিসেবে দুই দশকেরও বেশি সময় দায়িত্বপালন করেছেন। *সুইসাইড অ্যান্ড জেন্ডার* ম্যাগাজিনে তিনি বলেছেন—

> 'যারা সম্প্রতি আলাদা হয়ে গিয়েছেন বা বিবাহবিচ্ছেদের পথ বেছে নিয়েছেন, তাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। বিবাহবিচ্ছেদের শিকার পুরুষদের মধ্যে আত্মহত্যার হার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।'

২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে অ্যালিস জি ওয়ালটন ফোর্বস ম্যাগাজিনের জন্য লিখেছিলেন, 'আত্মহত্যায় লিঙ্গবৈষম্য : কেন পুরুষেরা এত বেশি ঝুঁকিতে?' তিনি ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে সামারিটানের প্রকাশিত ১৫৫ পৃষ্ঠার একটি নতুন গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সামারিটান ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি আত্মহত্যা প্রতিরোধ সংস্থা। পৃথিবীর বৃহত্তম সংস্থাগুলোর মধ্যে তারা অন্যতম। সংস্থাটি কেবল আত্মহত্যাপ্রবণদের সুরক্ষাই দেয় না, আত্মহত্যা প্রতিরোধে গবেষণাকার্যও পরিচালনা করে। *ফোর্বস*-এর নিবন্ধটি আকর্ষণীয় হলেও এতে মাত্রাতিরিক্ত অস্পষ্ট ভাষা এবং অসত্য শব্দের ফুলঝুরিতে সামারিটানের গবেষণাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। চেষ্টা চালানো হয়েছে, যাতে তার গবেষণাটিকে একটি নারী-ইস্যু হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। আমি জানি সমালোচনাটা বেশ কড়া, তবে আমার বিশ্বাস, প্রতিবেদনের সাথে তার নিবন্ধের তুলনা করলে আপনি আমার সমালোচনা আরও ভালোভাবে উপলব্ধি

করতে পারবেন: এমনকি নারীদের ওপর গুরুত্বারোপ করার চেষ্টা করে পুরো নিবন্ধটা তিনি লিখে শেষ করতে পারেননি।

তিনি লিখেছেন—'প্রায় প্রতিটি দেশে পুরুষেরা নারীদের চেয়ে অধিকহারে আত্মহত্যা করে। এটি বেশ বিস্ময়কর। কেননা, সাধারণত নারীদের (প্রতিবেদন অনুযায়ী) হতাশার মতো মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার হার বেশি।'

তার এই বক্তব্যই নিবন্ধের বাকি অংশ কীরূপ, তা বলে দেয়। এটা একধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা। আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন, কেন আমি এত কঠোর সমালোচনা করছি? গবেষণা প্রতিবেদনটির দিকে লক্ষ করা যাক। এর একদম শুরুতে থাকা এক্সিকিউটিভ সামারি থেকে এলিসের মনোভাব উপলব্ধি করা খুবই সহজসাধ্য। এখানে পুরো ভূমিকাটি উদ্ধৃত করছি—

> 'এই প্রতিবেদনটি আমাদের বলে দেয়, কেন নিম্ন আর্থসামাজিক অবস্থানে থাকা পুরুষেরা মধ্যবয়সে আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠে। সেখানে এই অপ্রয়োজনীয় মৃত্যুরোধে কিছু সুপারিশও পেশ করা হয়। সুইসাইড রিসার্চ আর পরিসংখ্যানের বাইরে গিয়ে প্রতিবেদনটি এসব মানুষের জীবন উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। চেষ্টা করে এ কথা বুঝতে, কেন তারা নিজেদের জীবনকে মূল্যহীন ভাবে। কেনই-বা জীবনের উদ্দেশ্য ও অর্থ হারিয়ে ফেলে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।
>
> প্রতিবেদনের মূল বার্তা হচ্ছে—আত্মহত্যাকে স্বাস্থ্য ও লিঙ্গবৈষম্য হিসেবে চিহ্নিত করা দরকার। পুরুষের প্রতি সমাজের অতিরিক্ত আশাবাদ কখনো কখনো তাদের আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। আত্মহত্যার প্রতিরোধে ব্যক্তিগত মানসিক সমস্যার দিকে মনোনিবেশ করার বদলে তাই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করা উচিত। এগুলোই মানুষকে আত্মহত্যাপ্রবণ করে তোলে।'

পুরুষদের আত্মহত্যাকে অ্যালিস শেষ পর্যন্ত মানসিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে, যা সামারিটানের গবেষণার ঠিক বিপরীত। আরও স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—

> সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার কারণে নারীদের চেয়ে পুরুষেরা বেশি আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠে। ইমোশনাল সাপোর্টের জন্য পুরুষেরা

> স্বভাবতই তাদের সঙ্গিনীর ওপর বেশি নির্ভরশীল। ফলস্বরূপ বিচ্ছেদের কারণে পুরুষেরা তীব্র কষ্ট ভোগ করে। সম্মানও পুরুষত্বের একটি অংশ। সকলের সম্মুখে সঙ্গিনীর আচরণে অসম্মানিত বোধ করলে তারা লজ্জিত ও অত্যধিক আবেগাক্রান্ত হয়ে যেতে পারে। কখনো কখনো প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে প্রাক্তন সঙ্গিনীকে শাস্তি দিতেও দ্বিধা করে না। এ ছাড়া সন্তানদের থেকে পুরুষদের পৃথক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অনেক ক্ষেত্রেই এটি আত্মহত্যায় ভূমিকা রাখে।'

এই প্রতিবেদনটি মারাত্মক। এতে স্পষ্টতই বিবাহ ও পারিবারিক মূল্যবো বিরুদ্ধে নারীবাদের প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণাকে পুরুষের আত্মহত্যা করার পেছ মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মূলত আমার উপসংহারগুলো সরাস সামারিটানের গবেষণা দ্বারা সমর্থিত। এই সমস্যার কার্যকর সমাধানের জ সকল স্তরে সরকারকে আহ্বান জানানোর পাশাপাশি পুরুষের আত্মহত্যা ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যকেন্দ্রিক সমস্যাগুলোকে মোকাবিলা করতে সামারিটা নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করে—

> 'আত্মহত্যা প্রতিরোধের কৌশলগুলোর ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক বৈষম্য ও লিঙ্গবৈষম্য হ্রাস করার পদক্ষেপ নিশ্চিত করুন। মধ্যবয়সে পুরুষেরা যে একাধিক অসুবিধার স্বীকার হন, তা সমাধানের জন্য আন্তঃসংস্থা কার্যক্রম চালু করুন। সেইসঙ্গে পুরুষদের জন্য আত্মহত্যার সাথে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট মানসিক কারণগুলোকে চিহ্নিত করে যথাযথ চিকিৎসা সরবরাহ করুন। পুরুষদের সাথে কাজ করার জন্য উদ্ভাবনমূলক পদ্ধতির বিকাশ ঘটান, যা দৈনন্দিন জীবনে পুরুষদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।'

এই বিষয়টি কেন মিডিয়ার এত কম মনোযোগ পেয়েছে? অথচ এই গবেষণাটি পুরুষদের মৃত্যুর পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুগান্তকারী কাজ। এর মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিয়ের বিরুদ্ধে নারীবাদের লড়াই পুরুষদের মৃত্যুর জন্য অনেকাংশে দায়ী। পুরুষদের আত্মহত্যার প্ররোচনায় নারীবাদীদের কুকর্ম প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার আতঙ্কে তারা এসব তথ্য লুকানোর জন্য এমন কোনো চেষ্টা নেই, যা করেনি। জ্যানেট ক্রমফিল্ড ২০১৪ সালের ২৪ এপ্রিল একটি আর্টিকেল লেখে—*Ex-wife drives her husband to commit suicde and*

*now claims his note is her intellectual property. You have got to be kidding me.*শিরোনামে। সেই ব্লগ পোস্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে—এক লোক আত্মহত্যা করার পূর্বে একটি চিরকুট লিখেছিলেন। তাতে লেখা ছিল, তিনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন। তিনি তখন বিবাহবিচ্ছেদ এবং লিঙ্গবৈষম্য দোষে দুষ্ট পারিবারিক আদালত দ্বারা নিপীড়িত।

২০১৪ সালের এপ্রিলে *A Voice For Men* কর্তৃক প্রকাশিত একটি অনলাইন উৎস থেকে ক্রিস্টোফার ম্যাকনির লেখা সেই সুইসাইড নোটটি পাওয়া যায়। পুরো নোটটি এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে—

'আমি কখনোই এসব বিষয়ে কথা বলতে চাইনি। শুধু নিরপেক্ষ ও ন্যায়সংগতভাবে আমার সন্তানদের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম স্বাধীনভাবে নিজের জীবনটা পুনরায় সাজিয়ে নিতে। বিষয়গুলো আমি ব্লগে লেখার চেষ্টা করেছি। ভেবেছিলাম এতে আমার কষ্ট লাঘব হবে। আমার তো কেউ ছিল না। আমি আমার প্রাক্তন স্ত্রীর আইনজীবীকে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলাম, পারিবারিক আদালত আমাকে নির্দেশ পরিবর্তন করার অনুমতি দিচ্ছে না। আমাকে বাচ্চাদের কোনো খোঁজখবরও রাখতে দেওয়া হচ্ছিল না। অধিকন্তু আদালতের ধার্যকৃত চাইল্ড সাপোর্টের ব্যয় আমার সাধ্যাতীত। আমি সরল মনে বিশ্বাস করছিলাম, তারা হয়তো এমন কোনো পদক্ষেপ নেবে, যাতে কিছুটা হলেও বৈরিতা কমবে। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। পাঁচ বছরেও না।

ফলে আমার মনে হয়েছে আমার ওপর যে নির্যাতন আর অবিচার হচ্ছে, তা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ এ বিষয়ে কথা বলা। মানসিক ও আইনি সহায়তা পাওয়ার জন্য আমার এই বৈরিতার নিরসন দরকার। যেন দুজন মিলে সন্তানদের লালন-পালন করতে পারি। যেকোনো একটা সমাধানের আশায় আমি পুনরায় প্রাক্তন স্ত্রীর আইনজীবীর কাছে গিয়েছিলাম। তারা কোনো সমাধান দেয়নি। এরপর আমি ব্লগ লিখতে শুরু করলাম; এমনকি ব্লগ লেখা শুরু করার পরেও আমি তাদের কাছে গিয়ে বলেছিলাম, যদি আমার বাচ্চাদের জন্য একজন আইনজীবী নিয়োগ করা হয়, তাহলে আমার ব্লগ সরিয়ে ফেলব। কিন্তু সেবারও কোনো জবাব দেয়নি তারা।

আমার স্ত্রী ডিনা জানত, এর ফলাফল এমন কিছু হতে পারে, তথাপি সে গ্রাহ্য করেনি। যতক্ষণ না আমি আমার বাচ্চাদের জীবন থেকে চিরতরে হারিয়ে যাই। আমি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছিলাম—লজ্জিত, অপদস্থ ও সন্তানদের দেখতে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর আমি যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছি, সেটা আমার

প্রাক্তন স্ত্রী আর তার আইনজীবীর হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছিল; আমাকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার অস্ত্র। আমি যা-ই করছিলাম, কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না।

আমি অসহায় ছিলাম। ভেবেছিলাম যে, কোনো একপর্যায়ে তৃতীয় পক্ষ জড়িত হবে। তারা উপলব্ধি করতে পারবে যে, আমার কাজগুলো ছিল মূলত আমার প্রতি সংঘটিত হওয়া জুলুমের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। অথচ সমস্ত গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে তৃতীয় পক্ষই একমাত্র সমাধান। সংঘাতের কারণ খুঁজতে তৃতীয় পক্ষ অপরিহার্য। পারিবারিক আদালতে আমার নিজেকে উপস্থাপন করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। কোনো কিছুর ওপরই কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না আমার। আদালত কেবল আমার প্রাক্তন স্ত্রীর আইনজীবীর সমস্ত আবেদন মঞ্জুর করছিল, তাদের অতিরঞ্জিত দাবি সব মেনে নিচ্ছিল। অনলাইনে আমি প্রচণ্ড সংঘাতপূর্ণ বিবাহবিচ্ছেদের ধরন নিয়ে পড়ছিলাম। আর সেগুলোকে আমার প্রাক্তন স্ত্রীর কর্মকাণ্ডের সাথে মিলাচ্ছিলাম। কীভাবে সে আমাকে সন্তান থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল, আমি যা-ই করেছিলাম, সবকিছুর অপব্যাখ্যা করছিল—সব স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম। তখন আমি তার সাথে খোলাখুলিভাবে সমস্যার সূত্র খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছি। বিশেষ লাভ হয়নি তাতে।

কেউ আমার পক্ষে কথা বলেনি; না কোনো ডাক্তার, না কোনো আইনজীবী। মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞরা এটাকে নিপীড়ন বলে অভিহিত করেছেন বটে, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে কেউই এ নিপীড়নের রকমসকম নির্ণয়ের চেষ্টা করেনি। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে আমি আদালতের দ্বারস্থ হতে পারতাম। কিন্তু যতক্ষণ না তাদের আচরণ নিপীড়ন হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে, আমার মামলা আদালতে কোনো গ্রহণযোগ্যতাই পাবে না।

বিষয়টি আমার কাছে এমন ছিল যে, আমি যদি চুপচাপ থাকতাম, নিপীড়ন চলতেই থাকত। আর তেমনটাই হয়ে আসছিল বরাবর।

সাইকোপ্যাথি হচ্ছে অত্যন্ত সংবেদনশীল ব্যাধি। কীভাবে মতবিরোধ নিয়ন্ত্রণ করছে—এটা দেখে সাইকোপ্যাথদের চিহ্নিত করা যায়। সাইকোপ্যাথদের সহানুভূতি, অপরাধবোধ, লজ্জা, অনুশোচনা কোনো কিছুই থাকে না। অন্যদের চরম দুর্দশায় তারা নির্বিকার থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ইচ্ছানুযায়ী সব হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাদের আসল রূপ দেখতে পাবেন না। আপনি যদি ক্ষমতাশীল বা মর্যাদাবান কেউ হয়ে থাকেন, তাহলেও সম্ভবত তাদের আসল রূপ আপনি দেখতে পাবেন না। তবে তাদের ঘনিষ্ঠ লোকজন বা মোটামুটি

ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা শেষ পর্যন্ত তাদের সত্যিকার রূপ দেখতে সমর্থ হয়। ধীরে ধীরে চারপাশের এইসব লোকজন বুঝতে পারে, তারা মূলত সাইকোপ্যাথদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, প্রভাবিত এবং প্রতারণার শিকার।

আমার মনে আছে ২০০৮ সালের মেমোরিয়াল ডে'র কথা। মধ্যাহ্নভোজের জন্য আমি আমার বাচ্চাদের তাদের দাদা-দাদির বাসা থেকে নিয়ে আসছিলাম। ডিনার বাবা পিট স্ক্যামারডো তখন গোলমাল করতে করতে আমার দিকে তেড়ে এলো। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম—"পিট, আপনি একটা ভাড়াটে গুণ্ডা"। সে উত্তর দিলো—"হ্যাঁ, একদম এবং এটা আমি বেশ উপভোগ করি!"

নিজের স্ত্রী, আমার সন্তান এবং ডিনার সামনেই সে এসব বলছিল। বাচ্চাদের নিয়ে গাড়িতে চড়তে যাব, এমন সময় আমার ছেলে আমাকে জিজ্ঞেস করল—"বাবা, ভাড়াটে গুণ্ডা কী জিনিস?"

পিট স্ক্যামারডো এবং ডিনা ম্যাকনি ছিল আদালতকে বোকা বানানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে সফল সাইকোপ্যাথ বাপ-বেটি জুটি। শুধু ফেয়ারফ্যাক্স শহরেই পিট স্ক্যামারডোর বিরুদ্ধে ১০০টিরও বেশি মামলা ছিল। এসব মোকদ্দমার মামলাকারীরা বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারবে। পুরো স্ক্যামারডো পরিবারই মেরিল্যান্ডের জাতীয় ব্যাংকের ৮০ মিলিয়ন ডলার অর্থ জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত।

যেদিন আমি জানতে পারলাম পিট স্ক্যামারডো একজন খুনি, পরদিনই সে আমাকে খুন করার জন্য জিম কটরেল ও কাইল বার্টলকে ভাড়া করেছিল। এবং এই হত্যাকাণ্ডের জন্য আইনি ফি নির্ধারণ করা হয়েছিল ১ মিলিয়ন ডলার। এসব মামলায় পয়সাখোর আইনজীবীদের কাজ হলো সাইকোপ্যাথের ঠান্ডা মাথার পরিকল্পিত খুনকে "মার্ডার বাই সুইসাইড" বলে অভিহিত করা।

আমি আমার সন্তানদের সাথে আদর্শ পিতা হিসেবেই ছিলাম। এ বিষয়ে কোনো বিতর্কের জো নেই। এমনকি ডাক্তার স্যামেনো শপথ করে বলেছিলেন, সন্তানদের সাথে আমার সম্পর্ক অটুট। আমি তাদের জীবনে অত্যন্ত স্নেহময় এবং ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও তাদের অভিভাবকত্বের জন্য আমাকে লড়াই করতে হচ্ছে—বিষয়টা বাবা হিসেবে আমার জন্য ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। আমার পারিবারিক জীবনে আনন্দ ও সুখের একমাত্র উৎস ছিল আমার সন্তানেরা। সন্তানদের অটুট পারিবারিক সম্পর্ক ও পিতা-মাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত করা বিচারপতি বেলোসের গর্হিত অপরাধ।

তিনি কখনো জানতে চাননি, ডাক্তার স্যামেনো প্রতারণা করেছিলেন কি না। তিনি এটাও জানতে আগ্রহী ছিলেন না, একজন অভিযুক্ত খুনির সাথে বিচারপতি টেরেন্সের ঠিক কীসের বন্ধুত্ব।

মেয়ের সাথে আমার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সে ছিল ভীষণ মিষ্টি, নম্র অমায়িক। কী দুর্ভাগ্য আমার! নিজ কন্যার সুন্দরী কনেতে পরিণত হওয়া দেখার সৌভাগ্য হলো না। গত তিন বছরে তার সাথে না থাকতে পারাটা আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে। একজন বাবা হিসেবে আমার মেয়ের আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান তৈরিতে আমি কঠোর চেষ্টা করেছি। সে চটপটে, চঞ্চল এবং নম্র, যদিও সে এখনও এসব বিষয়ে সচেতন নয়। আমি কামনা করি, আমার মেয়ে যেন তার দৃঢ়তা উপলব্ধি করতে পারে এবং তার নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস যেন ক্রমাগত বেড়েই চলে। আমি তোকে খুব ভালোবাসি রে লিলি!

ছেলে জ্যাকের অভিভাবকত্ব যখন আমি হারিয়ে ফেললাম, তখন সে কিন্ডার গার্টেনে পড়ে। সে মিশুক ও অকপট, বুদ্ধিমান ও সাহসী এবং অবশ্যই দুর্দান্ত ক্রীড়াবিদ। আমি আমার ছেলেটাকে পরিণত পুরুষ করে গড়ে তুলতে পারব না, এটা চিন্তা করতেও আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। তোকেও অনেক ভালোবাসি জ্যাক! তোদের দুজনকেই অনেক বেশি মনে পড়ছে।

বিবাহবিচ্ছেদের পর আমি স্বভাবতই ভেঙে পড়েছিলাম। সন্তানদের সাথে দেখা করার অনুমতি পর্যন্ত ছিল না আমার। আত্মবিশ্বাস নেমে এসেছিল শূন্যের কোঠায়। কখন না জানি প্রাক্তন স্ত্রীর কারণে জেলে যেতে হয়—এই ভয়ে তটস্থ থাকতাম সব সময়। কোনো সাইকোপ্যাথের টার্গেটে পরিণত হওয়ার এটাই নিয়তি।

তবুও আমি কোনোভাবেই ঝগড়াটে লোকে পরিণত হইনি। পারিবারিক আদালতের রায়ের আগে গ্রেফতারও হইনি কখনো। আমার ওপর যে ধকল ও চাপ এসেছিল, সেটা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ও পরিকল্পিত।

আমার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব এবং যারা পুরোটা সময়জুড়ে আমাকে সমর্থন করেছেন, তাদের সকলের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমি জানি, পুরো কার্যধারা চলাকালীন আমার প্রতিক্রিয়া ও আচরণ সব সময় সংগত ছিল না। আমার কাছেও সবটাই অর্থহীন মনে হয়েছে। আমার আইনজীবীরা একমাত্র যে পরামর্শটি আমাকে দিতে পেরেছে, সেটা হলো—চুপ থাকুন। যখন কেউই কোনো ব্যবস্থা

নিল না, আমি আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হলাম। কেননা, শেষ পর্যন্ত আমার মনে হয়েছে, নিজের ওপর কৃত অবিচারের অবসান ঘটানোর মতো কিছু বলতে বা করতে পারব না আমি। যতবার আমি হাঁটু গেড়ে বসতে চেয়েছি, তারা আমাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে। লোকেরা ভাবতে পারে, আমি কাপুরুষ বলে আমার সন্তানদের দায়িত্ব পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার জানা নেই, কীভাবে আমি এখান থেকে মুক্তি লাভ করতে পারব।

আইনজীবী, চিকিৎসা বা ওষুধের জন্য আমার কাছে কোনো অর্থ ছিল না। এই মামলার পেছনে ঘুরতে ঘুরতে আমি চারটি চাকরি হারিয়েছি। পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, আইনগত নিপীড়ন, অব্যাহত মানসিকভাবে অত্যাচার এবং আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি—এ সবকিছু আমাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিলো। আমি যদি সত্যিই সবকিছু সহ্য করে টিকে থাকতে পারতাম! কিন্তু মানসিক যন্ত্রণা, আদালত আর জেলে যাওয়ার ভয় তার চেয়েও প্রবল।

শোষণ মূলত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির ওপর নির্ভর করে। শোষিত ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়ান, তাদের পক্ষে কথা বলুন। যদি কেউ শোষণ নিয়ে কথা বলে, তাদের কথা বিশ্বাস করুন। অনুগ্রহ করে আমার সন্তানদের মানসিক ক্ষতিসাধন এবং প্রতারণার ক্ষতি সম্পর্কে সাবধান করবেন, নতুবা তাদের পরিণতিও আমার মতো হতে পারে। ঈশ্বর আমার আত্মার প্রতি করুণা করুন।'

আমি পারিবারিক আদালতের নথিগুলো পড়িনি। এমনকি এই লোকের মোকদ্দমার কোনো তথ্যের সত্যাসত্যও নির্ধারণ করছি না। তার চিরকুটের সত্যতা যাচাই করাও হয়তো সম্ভব নয়। তবে যেহেতু তার প্রাক্তন স্ত্রী অন্যদের থেকে চিরকুটের তথ্যগুলো লুকানোর জন্য চিরকুটটি কপিরাইটের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল, এ থেকেই আমার বিশ্বাস জন্মেছে—তার কথাগুলো কিছুটা হলেও সত্য। একই সঙ্গে আমার মনে হয়; বিবাহের বিরুদ্ধে নারীবাদীদের লড়াইয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট লিঙ্গবৈষম্যকারী পারিবারিক আদালতব্যবস্থা শুধু লোকটির মৃত্যুর জন্যই দায়ী নয়; বরং তার মতো আরও অনেকেরই মৃত্যুর কারণ। আত্মহত্যা করার পূর্বে তাদের হয়তো এমন চিরকুট লেখার হিম্মত ছিল না। অধিকন্তু এটি বিবাহের বিরুদ্ধে নারীবাদীদের অবস্থানের আরেকটি উজ্জ্বল উদাহরণ, যার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পূর্ণতই গিয়ে পড়েছে পুরুষের ওপর। নারীবাদের প্রভাবে পশ্চিমা সমাজ পুরুষদের এতটাই তুচ্ছ মনে করে যে, আমেরিকার সরকারকেও পুরুষদের বিরুদ্ধে নারীবাদীদের ধাপ্পাবাজির সহযোগী হতে হয়।

২০১০ সালের ৫ অক্টোবর ডেইলি কলার পত্রিকায় ক্যারোলিন মে Breast cancer recieves much more research funding, publicity than prostate cancer despite similer number of victims. শীর্ষক শিরোনামে একটি কলাম লেখেন। তার কলামে আমেরিকান জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট থেকে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত তথ্য ছিল—

> '২০১০ সালে ২,০৭,০৯০ জন নারী এবং ১,৯৭০ জন পুরুষ স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হন, যেখানে ৩৯,৮৪০ জন নারী ও ৩৯০ জন পুরুষের এই রোগে মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল। এই বছরে নতুন করে প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া সম্ভাব্য পুরুষের সংখ্যা ২,১৭,৭৩০ জন, যেখানে ৩২,০৫০ জনের এই রোগে মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে।'

মে যখন প্রোস্টেট ক্যান্সার ফাউন্ডেশনের পরিচালক ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জান জেনকার সাক্ষাৎকার নেয়, তিনি বলেছিলেন—'নারীদের কাছে স্তন ক্যান্সার যতটা যন্ত্রণাদায়ক, পুরুষদের প্রোস্টেট ক্যান্সারও পুরুষদের কাছে তেমন যন্ত্রণাদায়ক।'

কিন্তু এ রোগের ব্যাপারে আমেরিকান সরকারের প্রতিক্রিয়া কী ছিল? সে জানাচ্ছেন—'স্তন ক্যান্সারবিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিকারীরা বেশ ভালো কাজ করেছেন। তারা তাদের বার্তা ও সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। তবে তাদের সফলতা সত্ত্বেও সচেতনতা ও সরকারি তহবিল উভয় দিক থেকে প্রোস্টেট ক্যান্সার স্তন ক্যান্সারের চেয়ে অনেকটা পিছিয়ে। উদাহরণস্বরূপ, প্রোস্টেট ক্যান্সার গবেষণায় সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ স্তন ক্যান্সারের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। ২০০৯ অর্থবছরে স্তন ক্যান্সার গবেষণায় ৮৭২ মিলিয়ন সরকারি তহবিল প্রদান করা হয়। অন্যদিকে প্রোস্টেট ক্যান্সার গবেষণায় বরাদ্দকৃত অর্থ ছিল ৩৯০ মিলিয়ন। অনুমান করা যায়, ২০১০ অর্থবছরেও একই বিষয় দেখা যাবে, যেখানে স্তন ক্যান্সার গবেষণায় ব্যয় করা হবে ৮৯১ মিলিয়ন এবং প্রোস্টেট ক্যান্সার গবেষণায় ৩৯৯ মিলিয়ন।'

যদিও ফেমিনিস্টরা দাবি করে যে, তারা পুরুষ ও নারীবিদ্বেষীদের শোষণের শিকার, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে নারীবাদী মতাদর্শই মূলত পুরুষ এবং পরিবারের ওপর ক্রমাগত নিপীড়ন চালাচ্ছে, পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে প্রতিষ্ঠিত বহুবছরের চলে আসা সমাজব্যবস্থা।

মজুরি পার্থক্যজনিত মিথ্যাচার

মূলধারার মিডিয়া, নারীবাদী কর্মী এবং নারীবাদের হর্তাকর্তারা হরহামেশাই প্রচার করে বেড়ায়; পুরুষ ও নারীদের মজুরির ক্ষেত্রে ব্যবধান রয়েছে। তাই তাদের দাবি—যেহেতু নারীবাদীরা মজুরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার, তাদের আরও বেশি সুরক্ষার প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা ১২ মাস বিচিত্র গবেষণা, জরিপ এবং অন্যান্য চেষ্টা-চরিত্র করে ঘনঘন নিজেদের দাবির সত্যতা জানান দিতে থাকে। অথচ পুরো বিষয়টাই পুরোদমে ভাঁওতাবাজি। এক্ষেত্রে মজুরির ব্যবধান সম্পর্কিত ভুয়া নিউজের প্রতিবেদনগুলোর জুড়ি নেই! মূলধারার প্রায় সবগুলো মিডিয়াই এই অপরাধের সমান অংশীদার। জানি বক্তব্যটা উগ্র শোনাচ্ছে। কিন্তু মিডিয়ার এই মিথ্যাচারের প্রমাণ এতই বেশি যে, এর ওপরে গোটা একটা চ্যাপ্টারই লেখা সম্ভব। এতে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ধাপ্পাবাজির অকাট্য বাস্তবতা এবং যথাযথ প্রমাণ পেশ করা সহজ হবে।

আমি এখানে মজুরি ব্যবধান সম্পর্কে মিথ্যাচারের রহস্য উদ্‌ঘাটন করছি না, ইতিহাস ইতোমধ্যেই এই কার্য সাধন করে ফেলেছে। ১৯৬৩ সালেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেনেডি সমনিরাপত্তা অধিকার আইনে স্বাক্ষর করেন। 'দ্যা ইক্যুয়াল পে অ্যাক্ট' নামের এই আইনের মাধ্যমে পুরো দেশে নিয়োগকর্তাদের হাত থেকে নারীদের বিরুদ্ধে মজুরি বৈষম্যের সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়।

আইনটি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি বেশ প্রাসঙ্গিকভাবেই মন্তব্য করেন—'আমি নারী-পুরুষনির্বিশেষে সমান মজুরি আইন-১৯৬৩ কার্যকর করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত, যা মজুরির ক্ষেত্রে নারীদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারী

বৈষম্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। একই কাজের জন্য নারী কর্মচারীদের পুরুষদের চেয়ে কম বেতন দেওয়ার অযৌক্তিক চর্চা প্রতিরোধে এই আইনটি শ্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত একাধিক বেসরকারি সংস্থার বহু বছরের প্রচেষ্টার ফল। এই উদ্যোগটি আমাদের আইনে আরেকটি গণতান্ত্রিক কাঠামো যুক্ত করবে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের সুরক্ষা দেবে। তারা ভোট দেওয়ার যে অধিকার ভোগ করে, ঠিক তেমনি কর্মক্ষেত্রেও একই অধিকারভুক্ত হবে। আমি কংগ্রেসের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞ, যারা সমান মজুরি আইন প্রণয়নের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তারাই মূলত নারীদের কর্মক্ষেত্রে সমান মজুরির ক্ষেত্রে আমাদের সংকল্পকে দৃঢ় রাখতে সাহায্য করেছে।'

আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, সমান মজুরির জন্য নারীবাদী লড়াই অর্ধ শতাব্দী আগেই নিশ্চিত হয়েছিল। তাই যেসব নারীবাদী এবং তাদের নির্বোধ সহচররা তাদের ডাহা মিথ্যাচারকে বজায় রেখেছে, তাদের উদ্দেশে আমি বলতে চাই- ইতিহাসে সব সুস্পষ্ট, দয়া করে মিথ্যাচার বন্ধ করুন।

অন্যতম একটি সরকারি কর্তৃপক্ষ 'The Equal Employment Opportunities commission' এক দশকের পুরোনো এই আইনটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে বলেছিল—'সমান মজুরি আইনে নারী-পুরুষের একই প্রতিষ্ঠানে, সমান কাজের ক্ষেত্রে সমান বেতন প্রদান করা হবে। উভয় কাজই যে একই হতে হবে তা নয়, কিন্তু তাদের যথাসম্ভব সমান হতে হবে। পদ-পদবি নয়; বরং কর্মক্ষেত্রের বিষয়বস্তুই নির্ধারণ করবে তারা যথেষ্ট পরিমাণে সমান কি না। বিশেষত, ইপিএ মতে যাদের চাকরির ক্ষেত্রে সমান দক্ষতা, প্রচেষ্টা এবং দায়িত্বগ্রহণ প্রয়োজন, নিয়োগকর্তারা সে সকল নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে অসম মজুরি নির্ধারণ করতে পারবেন না। যেসব কাজ একই প্রতিষ্ঠানে একই পরিবেশে করা হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রেও কোনোরূপ বৈষম্য বৈধ নয়।'

অধিকন্তু, বিষয়টিকে তারা আরও স্পষ্ট ভাষায় দক্ষতা, প্রচেষ্টা, দায়িত্ব এবং কাজের পরিবেশ সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছেন। দক্ষতা মাপার মানদণ্ড সম্পর্কে সেখানে বলা হয়েছে—'কাজ সম্পাদনের জন্য বিবেচ্য বিষয় হলো—অভিজ্ঞতা, সক্ষমতা, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ। চাকরির জন্য কর্মীর কী কী দক্ষতা থাকা প্রয়োজন সেটাই মুখ্য বিষয়; কর্মীর কী কী দক্ষতা আছে সেটা নয়। উদাহরণস্বরূপ, ইপিএর অধীনে দুজন হিসাবরক্ষকের কাজ সমান, যদিও-বা একজন হিসাবরক্ষকের পদার্থবিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি থাকে, যেহেতু মাস্টার্স ডিগ্রি থাকাটা উক্ত চাকরির ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়।'

অনুরূপ প্রচেষ্টাকে কিছু বিষয় দিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন : 'চেষ্টা হলো কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শারীরিক বা মানসিক উদ্যম থাকা। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক নারী ও পুরুষরা একটি লাইনে মেশিনের অংশ একত্রীকরণে পাশাপাশি কাজ করছে। লাইনের শেষের ব্যক্তিকে কাজ সমাধা করার পর অবশ্যই একত্রিত অংশ উত্তোলন করে একটি তক্তায় রাখতে হবে। লাইন থেকে একত্রিত পণ্য যদি যথেষ্ট পরিমাণে উত্তোলন করতে হয় এবং এটা যদি কাজের নিয়মিত অংশ হয়, তাহলে এই কাজে লাইনের অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ফলে এই কাজ সম্পাদনকারীকে তার কাজের জন্য লাইনের অন্যদের চেয়ে বেশি পরিমাণ মজুরি দিলেও আইন লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে না। কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তি নারী বা পুরুষ যে-ই হোক না কেন।'

দায়িত্বকে চিহ্নিত করার উপায়—'কাজ সম্পাদন করার জন্য যে পরিমাণে দায়বদ্ধতা থাকা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন বিক্রয়কর্মীর কাজ গ্রাহকদের ব্যক্তিগত চেক গ্রহণ করা। তার দায়িত্ব অন্য বিক্রয়কর্মীদের চেয়ে অনেক বেশি। অন্যদিকে দায়িত্বের ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্যের জন্য মজুরির কমবেশি করা যাবে না। যেমন : কাজ শেষে লাইট বন্ধ করে দেওয়া।'

কাজের পরিবেশ নির্ধারিত হয় দুটি উপায়ে। এগুলো হলো—

১. ভৌত পরিবেশ: যেমন : তাপমাত্রা, বাতাস এবং বায়ু চলাচলব্যবস্থার পরিস্থিতি দেখে।

২. কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনার মাধ্যমে।

কারও সাথে মজুরি বৈষম্য করা হচ্ছে কি না, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধু এগুলোই বিবেচ্য বিষয় নয়। তারা মজুরির পার্থক্যের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা, যোগ্যতা, উৎপাদনের গুণ-মান বা পরিমাণ অথবা লিঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনো কারণ। এর দ্বারা মূলত কী বোঝায়? সহজ কথায় এর মানে হলো—যদি কোনো নারী ও পুরুষের চাকরির পদবি একই হয় এবং পুরুষ লোকটির ওপর তার নারী সহকর্মীর চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, দায়িত্ববোধ ন্যস্ত থাকে অথবা সে তুলনামূলক ভালো কর্মী হয়, তাহলে পুরুষ লোকটি বেশি বেতন পাবে।

একজন নারীর কর্মক্ষেত্রে কম আয় করার অর্থ এই নয় যে, তার আরও বেশি অর্থ উপার্জন করার কথা ছিল। অন্য যে কারও মতোই তার নিজের যোগ্যতায় উপার্জন করা উচিত। কারণ, সমান সুযোগ মানে হলো পুরুষদের মতো

নারীদেরও সমানভাবে কাজের সুযোগ দেওয়া। আইনত সমান মজুরি পাওয়ার জন্য তাকে অন্যান্য পুরুষ সহকর্মীর মতো কর্মে সততা, মেধা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের নমুনা দেখাতে হবে।

নারীবাদীরা কেন এই আইন নিজেদের অনুসারীদের বোঝাচ্ছেন না? নারীবাদী সংস্থাগুলো ঠিক কী কারণে এক দশকেরও পুরোনো এত গুরুত্বপূর্ণ একটি আইন লুকিয়ে রেখেছে? নারীবাদীরা হয়তো জবাব দেবে, আইনটি নিশ্চিত করা হলেও এখনও সেটা সর্বক্ষেত্রে কার্যকর নয়। ফলে মজুরির ব্যবধান রয়ে গেছে। সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য গবেষণা এবং তথ্যানুযায়ী—যদিও মজুরির ব্যবধান এখনও বিদ্যমান, কিন্তু অভিজ্ঞতা, কাজের শর্ত, প্রশিক্ষণ এবং নমুনার তুলনায় এই ব্যবধান ৪% থেকে ৭%-এর মধ্যে। বেশির ভাগ বস্তুনিষ্ঠ এবং নামকরা গবেষকদের নিকট এই পরিসরের পার্থক্য নিতান্তই নগণ্য।

এমনকি ক্রিস্টিনা হফ সমারসের মতো প্রসিদ্ধ নারীবাদী স্কলারও একই মতামত দেন। ক্রিস্টিনা দর্শনের ওপর তার পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। পেশাসূত্র তিনি ছিলেন ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। পরবর্তী সময়ে ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ক্রিস্টিনা অসংখ্য বই রচনার পাশাপাশি অনলাইন ভিডিও সিরিজ 'The Factual Feminist' তৈরি ও প্রচার করেছেন।

এ ছাড়াও তিনি ফাউন্ডেশন ফর ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস ইন এডুকেশনের বোর্ড অব অ্যাডভাইজারের একজন সদস্য। মিডিয়াতে অসাধারণ যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখার জন্য ২০১৩ সালে তিনি 'The National Women's Political Caucus' থেকে সম্মাননা পুরস্কার লাভ করেন। ২০১২ সালের ৪ নভেম্বর তিনি তার হাফিংটন পোস্টের এক কলামে অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন-এর 'Graduating to a Pay Gap' গবেষণাপত্রটি ব্যবহার করে মজুরি ব্যবধানসংক্রান্ত প্রচলিত মিথের স্বরূপ উন্মোচন করেন। এরপর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবিভাগ পরিচালিত ৫০টিরও বেশি গবেষণালব্ধ দলিল নিরীক্ষণ করেন। শ্রমবিভাগের বক্তব্যটি ছিল এমন—

> 'সম্ভবত মজুরির ব্যবধান প্রায় সম্পূর্ণরূপে নারী ও পুরুষ কর্মীদের নিজস্ব পছন্দের ওপর নির্ভর করে।'

মজার বিষয় হলো—নারীবাদীরা ব্যক্তিগতভাবে হফ সমারসকে আক্রমণ করলেও তার গবেষণা নিয়ে কেউ কখনোই প্রতিবাদ করেনি। প্রকৃতপক্ষে,

তারা সমারসকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করতে এতটাই মগ্ন ছিল যে, তার অবস্থান নিয়ে যৌক্তিক আপত্তি তোলার ফুরসতই পায়নি। অধিকন্তু শ্রমবিভাগও তার মতামত সমর্থন করে। ২০০৯ সালের ১২ জানুয়ারি শ্রমবিভাগ 'An Analysis of the Reasons for the Disparity in Wages Between Men and Women' শীর্ষক ৯৫ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটির একদম শুরুতে ফেডারেল কন্ট্রাক্ট কমপ্লায়েন্সের শ্রমবিভাগের সহকারী সচিব চার্লস ই জেমস সিনিয়র বলেন—

> 'বিগত তিন দশক ধরে নারীরা কর্মক্ষেত্রে এবং মজুরির সমতায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় উন্নতি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে শ্রমশক্তির বৃদ্ধি, শিক্ষাগত সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, উচ্চ বেতনের পেশায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং প্রকৃত আয়ের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় উন্নতি লাভ।
>
> তবে এত সব অর্জনের পরও মজুরি ব্যবধানের পেছনের কারণগুলো পুরোপুরি ব্যাখ্যা না করে পাবলিক পলিসি অ্যাজেন্ডাকে অগ্রসর করার মতলবে এই ব্যবধান সম্পর্কে ভুলভাল তথ্য দেওয়া হচ্ছে।'

সোজা কথায়, ফেমিনিস্টদের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা এগিয়ে নিতে তারা মজুরি ব্যবধান বিষয়ে অসততা অবলম্বন করছে। শ্রমবিভাগের কর্মকর্তারা কেন এমন মারাত্মক বক্তব্য দিয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তর প্রতিবেদনেই রয়েছে—

> 'অর্থনৈতিক গবেষণা অনেক বিষয় খুঁজে বের করেছে, যেগুলো লিঙ্গভিত্তিক মজুরি ব্যবধানের জন্য দায়ী। তন্মধ্যে কিছু বিষয় হচ্ছে—কাজ, ব্যক্তিগত জীবন ও পারিবারিক জীবনে ব্যালেন্স আনতে নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যবধান।'

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, রিপোর্টে এমন কোনো উপসংহার নেই, যেখানে বলা আছে—মজুরির ব্যবধান একধরনের পিতৃতান্ত্রিক নিপীড়ন। এ কথাও নেই যে, এটি কোনো আদর্শিক রূপকথার ফলাফল; অথচ ফেমিনিস্টরা এগুলো বলেই মুখে ফেনা তুলে ফেলে। প্রকৃতপক্ষে, আমি নারীবাদী মতাদর্শ ধারণ করে না—এমন কারও দ্বারা পরিচালিত কোনো তথ্য বা গবেষণা খুঁজে পাইনি, যা 'নারীর প্রতি বৈষম্যই মজুরি ব্যবধানের কারণ' ফেমিনিস্টদের এই ধারণাটিকে সমর্থন করে।

ধর্ষণ জালিয়াতির মহামারি

রবিন মরগ্যান একবার *মিসেস* ম্যাগাজিন-এ ধর্ষণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন—'যতক্ষণ পর্যন্ত না নারীরা স্বেচ্ছায় যৌনসংগমে লিপ্ত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে ধর্ষণ বলে বিবেচনা করা হবে।'

অপরদিকে মহামারি (Pandemic) সম্পর্কে *মেরিয়াম ওয়েবস্টার* ডিকশনারি বলছে—'বিস্তৃত ভৌগোলিক অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে পড়া রোগের উপদ্রব, যা বেশির ভাগ জনগণের ওপর প্রভাব ফেলে।'

ইতিহাসজুড়ে বিভিন্ন সময় অনেক মহামারি দেখা গিয়েছে। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো ইউরোপিয়ান ব্ল্যাক প্লেগ। ইতিহাসবিদদের তথ্যানুসারে, ১৩৩৮ সালের শুরুর দিকে এশিয়ার বর্তমান কিরগিজস্তানে এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ১৩৪৬ সালের মধ্যে ব্ল্যাক প্লেগ শেষ পর্যন্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং ৭০ থেকে ৮০ মিলিয়নের মতো মানুষ মৃত্যুবরণ করে। কমপক্ষে ৪৫% থেকে ৫০% অর্থাৎ প্রতি দুজনে একজন ইউরোপীয় এই রোগে মারা যায়। চিন্তা করুন, একটি রোগ কতটা ভয়াবহ হলে আপনার পরিচিতদের মধ্যে অর্ধেকসংখ্যকই সেই রোগে মৃত্যুবরণ করে! আপনার বন্ধুবান্ধব, পরিবার, সহকর্মী, প্রতিবেশীসহ সবাই। এই প্লেগ ইউরোপীয় সমাজকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল বললেও কম বলা হবে। যারা জীবিত ছিল তারা এতটাই আতঙ্কের সাথে বেঁচেছিল যে, কুষ্ঠরোগী কিংবা ভিক্ষুক থেকে শুরু করে বহিরাগত কাউকে দেখলেই রীতিমতো দুই ক্রোশ দূরে তাড়িয়ে দিয়ে আসত। শুধু তা-ই নয়, ব্রণ এবং চর্মরোগীদেরও ব্ল্যাক প্লেগ বহনকারী সন্দেহ করে নির্বিচারে মেরে ফেলত তারা।

ব্ল্যাক প্লেগ রোগের বহু বছর পরে, বিশ শতকের শেষার্ধে আমেরিকার জনগণ আরেক মরণঘাতক এইডস রোগ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ১৯৮১ সালের ৫ জুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র কতিপয় তরুণ, স্বাস্থ্যবান সমকামী পুরুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া *নিউমোসিসটিস ক্যারিনি নিউমোনিয়া* নামক একটি দুর্লভ সংক্রামক রোগের কথা উল্লেখ করে।

এইডস মহামারির বিষয়ে এটাই ছিল প্রথম কোনো সরকারি প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বড়ো বড়ো সংবাদমাধ্যমগুলো সংবাদটি ছড়িয়ে দেয় এবং সারা দেশের ডাক্তাররা রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে একই রকম সংক্রমণের একাধিক বিবরণী পেশ করে। বছরের শেষে ২৭০ জন ব্যক্তি সংক্রামিত হয়, মারা যায় ১২১ জন।

১৯৮২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো এই রোগের জন্য এইডস শব্দটি ব্যবহার করা হয়। পূর্বের অন্যান্য মহামারির মতো এইডসের ক্ষেত্রেও লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং একইভাবে যারা আক্রান্ত নয়, তারা আশপাশের মানুষদের দমন করতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, রিকি রে নামে ১৫ বছরের এক এইচআইভি হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত বালকের কথা। ১৯৮৭ সালে তাকে এবং তার এইচআইভি আক্রান্ত ভাই-বোনদের বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতির জন্য ফেডারেল কোর্টে লড়াই পর্যন্ত করতে হয়েছিল। কোর্ট শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু সমাজের লোকজন তাদের বয়কট করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি। এর জের ধরে ১৯৮৭ সালের ২৮ আগস্ট তাদের বাড়িঘর সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রে ১৯৯২ সালে মৃত্যুবরণ করে।

আশপাশের মানুষ কর্তৃক বৈষম্যের শিকার হওয়া অসংখ্য এইচআইভি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রিকি একটি উদাহরণ মাত্র। দুরারোগ্য ব্যাধি এবং মহামারির এই ভয়ংকর ইতিহাসের সঙ্গে আমরা ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ ও তার সামাজিক প্রভাবকে মিলিয়ে পাঠ করতে চাই।

ধর্ষণ, নিপীড়ন এবং অজাচারবিষয়ক জাতীয় সংস্থা 'RAINN—Rape Abuse & Incest National Network'-এর তথ্যানুসারে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ছয়জনে একজন নারী তাদের জীবনকালে হয় ধর্ষণ, নতুবা ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হয়। উক্ত সংস্থার মতে, এর অর্থ হচ্ছে—যুক্তরাষ্ট্রের নারীদের প্রায় ১৭% ধর্ষণের শিকার। ২০১৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অ্যাসোসিয়েশনের

জরিপের ওপর ভিত্তি করে একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়, যেখানে দেখা যায়—প্রতি চারজনে একজন কলেজছাত্রীই যৌন হয়রানির মুখোমুখি হয়। যদিও পশ্চিমা বিশ্বে ধর্ষণকে রোগ হিসেবে গণ্য না করে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, নারীবাদীরা এটাকে ধর্ষণ সংস্কৃতির মহামারির ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করতেই সদা তৎপর। যদি ওপরের পরিসংখ্যানটি সঠিক হতো, তাহলে তাদের এই উক্তি সঠিক বলে মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন আর সেই বাস্তবতা তাদের মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট

অন্যান্য সকল আধুনিক ও সভ্য সমাজের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রেও ধর্ষণ এবং যৌন হয়রানিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। আমাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায়বিচারব্যবস্থার অন্যতম অলঙ্ঘনীয় নীতি হচ্ছে লিগ্যাল প্রিজাম্পশন। এই নীতি অনুযায়ী যতক্ষণ না কোনো অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আইনত সে নিরপরাধ বলে বিবেচিত হবে। ব্যক্তিদের নিরপরাধ প্রমাণ করার এই আইনি অনুমান ১৯৮৫ সালে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের কফিন বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মামলায় বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। *নোলোস প্লেইন ইংলিশ ল ডিকশনারিতে* সুপ্রিম কোর্ট প্রদত্ত সেই সংজ্ঞাকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

> 'যুক্তরাষ্ট্রের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার অন্যতম অলঙ্ঘনীয় নীতি হচ্ছে—একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না দোষী প্রমাণিত হচ্ছে, তাকে নির্দোষ হিসেবে গণ্য করা হবে। অন্য কথায়—মামলাকারীকে অবশ্যই সন্দেহের বাইরে গিয়ে অভিযোগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতে হবে।'

অধিকন্তু, ফৌজদারি আদালতে একজন ধর্ষণ আসামিরও তার অভিযোগকারীকে মোকাবিলা করার এবং ন্যায়বিচার চাওয়ার অধিকার আছে। অধিকার রয়েছে তার নিজের পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ করার। এমনকি আসামির যদি নিজের পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ করার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে আদালত বিনামূল্যে তাদের পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ করবে। এই অধিকারসমূহ শুধু ধর্ষণের আসামিদের ক্ষেত্রেই নয়; বরং যেকোনো অপরাধে অভিযুক্ত নাগরিকদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকার অন্যান্য যেকোনো অপরাধের মতো ধর্ষণ এবং যৌন হয়রানির পরিসংখ্যানও নজরদারিতে রাখে। বিশেষত ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এবং ব্যুরো অব জাস্টিস স্ট্যাটিসটিকস নামে দুটি সংস্থা

দেশজুড়ে স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিবেদনকৃত বিভিন্ন অপরাধ লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, তারা প্রতিটি অপরাধের ধরন ব্যাখ্যা করে প্রতিবছর সেই তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়।

২০১৩ সালের পূর্বে ইউনিফর্ম ক্রাইম রিপোর্টিংয়ের অধীনে এফবিআইয়ের ধর্ষণের সংজ্ঞা ছিল—

> 'নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং জোরপূর্বক যৌনসম্পর্ক স্থাপন।'

তবে ২০১৩ সালের শুরুতে ধর্ষণের সংজ্ঞা থেকে 'জোরপূর্বক' শব্দটি সরিয়ে কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়। ইউনিফর্ম ক্রাইম রিপোর্টিংয়ের সেই সংশোধিত সংজ্ঞাটি হলো—

> 'ভুক্তভোগীর সম্মতি ছাড়াই তার গোপনাঙ্গ কিংবা মুখগহ্বরে শরীরের কোনো অঙ্গ বা বস্তু অনুপ্রবেশ করানো (সেটা যত সামান্যই হোক না কেন)।'

এ ছাড়াও ধর্ষণের প্রচেষ্টা অথবা ধর্ষণের উদ্দেশ্যে যৌন হয়রানিও নতুন এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। রেইন এবং নারীবাদী সংস্থাগুলোর অভিযোগ—সারা দেশে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি মহামারি আকার ধারণ করেছে; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ডেটা সরাসরি এবং কঠোরভাবে তাদের এই অভিযোগ নাকচ করে দেয়। এফবিআই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ১,০০,০০০ জন ব্যক্তির ওপর ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পুরাতন সংজ্ঞানুযায়ী প্রতিবেদনে পাওয়া যায়, ১৯৯৫ সালে প্রতি ১,০০,০০০ জনে ৩৭.১ জন নারী ধর্ষণের শিকার। ২০১৩ সালে পরিবর্তিত সংজ্ঞা অনুযায়ী ২০১৩ ও ২০১৪ সালে এই হার প্রতি ১,০০,০০০ জনে ১০ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিষয়টি মনে রেখে আমরা যৌক্তিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারি, ২০১৩ সালের বিশদ সংজ্ঞা মোতাবেক ১৯৯৫ সালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় রিপোর্টকৃত ধর্ষণের প্রকৃত সংখ্যা ছিল প্রতি ১,০০,০০০ জনে ৪৭.১ জনের কাছাকাছি।

কিন্তু নারীবাদীদের দাবি—যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণ অপরাধ সম্পর্কে যথেষ্ট কম অভিযোগ দায়ের করা হয়। ব্যুরো অব জাস্টিস স্ট্যাটিসটিকস অবশ্য তাদের মতামতকে সমর্থন করে। ২০১৩ সালের মার্চে ব্যুরো অব জাস্টিসের পক্ষ থেকে 'যৌন সহিংসতার শিকার নারী : ১৯৯৪-২০১০' শীর্ষক বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়—'১৯৯৫ সালে নারীদের বিরুদ্ধে ২৯ শতাংশ ধর্ষণ ও যৌন হয়রানিমূলক নিপীড়নের পুলিশি রিপোর্ট হয়েছে। ২০০৩ সালে এই হার ৫৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়; কিন্তু ২০১০-এ তা পুনরায় ৩৫ শতাংশে নেমে আসে।'

আগেই বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের আইনি পদ্ধতি অনুযায়ী দোষ প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু নারীবাদীদের অবস্থান হলো, বিচারিক আদালতে নির্দোষিতা অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগেই তারা দাবি করামাত্র অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বলে বিবেচিত হবে। তাদের এই নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থাপনায় লিগ্যাল প্রিজাম্পশনের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আশ্চর্যজনকভাবে ব্যুরো অব জাস্টিসের ২০১৩ সালের মার্চের প্রতিবেদনটি দোষী সাব্যস্তকরণের নারীবাদী অভিমতকে অনুসরণ করে প্রকাশিত হয়। সংস্থাটি ধরে নেয়, কোনো নারীর পক্ষ থেকে ধর্ষণ বা যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠলেই সেটি সত্য এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রকৃতই দোষী। অথচ তখনও ফৌজদারি বিচারে আসামি দোষী বলে সাব্যস্তই হয়নি। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, ধর্ষণ বিষয়ে ব্যুরো অব জাস্টিসের রিপোর্টের চেয়ে ভালো কোনো তথ্যসূত্র আমাদের হাতে নেই। আমরা এটি ব্যবহার করতে একরকম বাধ্য হচ্ছি। এই বিষয়টি মাথায় রেখে ১৯৯৫ সালের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে আমরা বলতে পারি, ৭১ শতাংশ ধর্ষণ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিকট যায় না।

আমরা পূর্বেই বলেছি—যদি এফবিআইয়ের ২০১৩ সালের ধর্ষণের সংজ্ঞাটি ১৯৯৫ সালে ব্যবহৃত হতো, তাহলে প্রতি ১,০০,০০০ জনে প্রায় ৪৭.১ সংখ্যক ধর্ষণের রিপোর্ট পাওয়া যেত। যদি আমরা ব্যুরো অব জাস্টিসের 'রিপোর্ট হয় না' তত্ত্বকে আমলে নিই এবং সকল সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দোষী বলে মানি, তাহলে ১৯৯৫ সালে ৪৭.১ সংখ্যাটি যৌন হয়রানিমূলক কাজের প্রকৃত সংখ্যার ২৯ শতাংশকে নির্দেশ করে। কাজেই যদি ধর্ষণের সবগুলো প্রতিবেদনকে সত্য ধরা হলে প্রতি ১,০০,০০০ জনে ১১৫.৩টি ধর্ষণ সংঘটিত হয়েছে, যেগুলোর প্রতিবেদন পাওয়া যায় না। প্রতিটি ধর্ষণের প্রতিবেদনই নির্ভুল গণ্য করে এই সংখ্যাটির সাথে মূল ৪৭.১ সংখ্যা যোগ করলে ১৯৯৫ সালে প্রতি ১,০০,০০০ জন নারীর ওপর সংঘটিত ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১৬২.৪টি। এখন এই একই সংখ্যা ২০১৪ থেকে আমরা যে সংখ্যা জানি, সেগুলোর সাথে একত্র করি। এফবিআই ২০১৪ সালে প্রতি ১,০০,০০০ জনে ৩৬.৬টি ধর্ষণের প্রতিবেদন নথিভুক্ত করে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, এটা ২০১৪ সালের মাত্র ২৯ শতাংশ। যদি সকল ধর্ষণের রিপোর্ট করা হতো, তাহলে ব্যুরো অব জাস্টিসের প্রতিবেদন অনুসারে এবং তাদের ১৯৯৫ সালের তত্ত্ব মোতাবেক ২০১৪ সালে ধর্ষণের সংখ্যা হতো প্রতি ১,০০,০০০ জনে ১২৬.২টি।

যদি আপনি বস্তুতভাবে নিরিখে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি পরিসংখ্যানের আলোকে বিচার করতে যান, তাহলে মাত্র ০.২ শতাংশ নারী ধর্ষণের শিকার। এটা মোটামুটি একটি হিসাব। প্রকৃত সংখ্যা মূলত এর চেয়েও কম—০.১৬%-এর কাছাকাছি এবং এই সংখ্যাটি পাওয়া যাচ্ছে প্রতিটি ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই বিচারের আগেই দোষী বলে ধরে নেওয়ার পর! মনে রাখবেন, এই সংখ্যাগুলো নিছকই থানায় রিপোর্ট করা হয়েছে এমন ধর্ষণের সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে। কোনোক্রমেই এটা ফৌজদারি আদালত দ্বারা দোষী প্রমাণিত অপরাধীদের সংখ্যা নয়।

এগুলো শুধু প্রাথমিক প্রতিবেদন। এই সমস্ত লিখিত প্রতিবেদনের মধ্যে কতজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে? ২০১৪ সালে একটি তদন্তের পর এফবিআই দেখতে পায়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থারা তাদের কাছে রিপোর্ট করা ধর্ষণ মামলার মাত্র ৩৮% থেকে ৩৯% সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই গ্রেফতার করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছে। আপনারা বিষয়টাকে 'দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে নির্দোষ গণ্য করা' (লিগ্যাল প্রিজাম্পশন) মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিচার করলে দেখতে পাবেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট দায়েরকৃত বাকি ৬১% ও ৬২% ধর্ষণ বা যৌন হয়রানি মামলা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করার মতো যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যই নয়। মনে রাখবেন, ফৌজদারি তদন্ত শেষেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিষয়টা নিয়ে একটু চিন্তা করা যাক।

যুক্তরাষ্ট্রের লিগ্যাল প্রিজাম্পশন মানদণ্ড মানলে এফবিআইয়ের অনুসন্ধান অনুসারে ৬১% বা প্রতি পাঁচজনে তিনজনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের যে মামলা পুলিশের কাছে দায়ের করা হয়, সেগুলো সম্পূর্ণ ভুয়া। এফবিআইয়ের অনুসন্ধানকৃত তথ্যগুলো যুক্তরাষ্ট্রের আইডাহোর বিংহাম প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী অফিসার (শেরিফ) ক্রেগ রোল্যান্ড ব্যক্তিগতভাবে অনুমোদন করেন এবং জনসম্মুখে বিবৃতি দেন—'বেশির ভাগ দায়েরকৃত ধর্ষণ মামলার ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সেগুলোতে প্রকৃতপক্ষে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিল।'

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে শেরিফের কার্যালয় বরাবরই ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির মামলার তদন্ত করে থাকে এবং এ কাজে তারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ। দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং প্রশিক্ষিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একজন কর্মকর্তার এই বক্তব্য নিশ্চিতভাবেই আমাদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হলো—বিজ্ঞান শুধু ভুয়া ধর্ষণ মামলার মুখোশই উন্মোচন করে না, নারীরা কেন প্রথমত ধর্ষণের মিথ্যা মামলা দায়ের করে, সেটিও চিহ্নিত করে। পারডিউ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের ডক্টরেট ডিগ্রিধারী ইউজিন জে কানিন নয় বছর ধরে 'ধর্ষণের মিথ্যা মামলা' নামে একটি গবেষণাকার্য পরিচালনা করেন। ১৯৯৪ সালে *সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার আর্কাইভে-এর* ২৩ নং ভলিউমের ১ নম্বরে এটি প্রকাশিত হয়। *সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার-এর আর্কাইভ* প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালে।

বলে রাখা ভালো, এটি সেক্স গবেষণার একটি অফিশিয়াল প্রকাশনী এবং যৌনবিদ্যার ওপর একটি সর্বজনস্বীকৃত পিয়ার রিভিউড অ্যাকাডেমিক জার্নাল। তবে কানিনের গবেষণায় একটা সীমাবদ্ধতা ছিল। এটি শুধু সেসব সফল ধর্ষণের ওপরই পরিচালিত হয়েছে, যেগুলোর অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ধর্ষণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে মর্মে যে মামলাগুলো হয়েছিল, সেগুলো এই গবেষণায় মোটের ওপর আমলেই নেওয়া হয়নি। ডক্টর কানিন যেই পুলিশ বিভাগটিকে গবেষণার জন্য বাছাই করেছিলেন, অভিযোগের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য সেখানকার কর্মকর্তাদের পদ্ধতিটি ছিল যথেষ্ট অভিনব। কোনো ধর্ষণের অভিযোগ এলেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তারা প্রথমে শপথ ভঙ্গের দণ্ড (Penalty of Perjury)-বিষয়ক একটি বিবৃতিতে অভিযোগকারীর স্বেচ্ছা স্বাক্ষর নিত। সেখানে লেখা থাকত—'যে ধর্ষণের অভিযোগটি করা হচ্ছে, সেটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।' ধর্ষণের অভিযোগকারী নারী যদি বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃতি জানাত, তাহলে কর্মকর্তারা বা কানিনের গবেষণা—উভয়েই অভিযোগটি সত্য বলে অভিহিত করত।

ডক্টর কানিনের গবেষণানুযায়ী ধর্ষণের ৪১% মামলাই ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়। যেহেতু তার গবেষণা নয় বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছিল, কাজেই এটা প্রতিবছর মিথ্যা মামলার হার অনুসন্ধান করে। বিস্ময়ের সাথে তারা লক্ষ করে, কোনো বছর মিথ্যা মামলার হার ২৩% থাকলেও অন্য বছর সেটা হয়ে যায় এক লাফে ৭০%!

কানিনের গবেষণাটি কত শতাংশ নারী ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ করে—তা নির্ণয় করার পাশাপাশি প্রধানত কী কী কারণে তারা মিথ্যা মামলা দায়ের করে, সেটাও অনুসন্ধান করেছে। তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে কানিন দেখতে পান, মূলত তিনটি উদ্দেশ্যে নারীরা ধর্ষণ সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ করে।

এক. ভুয়া ধর্ষণ মামলার প্রায় ৫৬% অভিযোগ মূলত ব্যবহৃত হয় পারস্পরিক সম্মতিতে করা যৌনসংগমকে আড়াল করার অজুহাত হিসেবে। ডক্টর কানিন নিম্নোক্ত উদাহরণগুলো লিপিবদ্ধ করেন—'একজন ৩০ বছর বয়স্ক বিবাহিত নারী রিপোর্ট করেন—তিনি তার অ্যাপার্টমেন্টে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। কিন্তু পলিগ্রাফ তদন্তে তিনি স্বেচ্ছায় যৌন মিলনের কথা স্বীকার করেন এবং বলেন—তিনি সঙ্গীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ধর্ষণ মামলা করেছেন গর্ভবতী হওয়ার আতঙ্ক থেকে। সে সময় তার স্বামী ছিল বিদেশে।'

দুই. এ ছাড়া মিথ্যা ধর্ষণ মামলার প্রায় ২৭% দায়ের করা হয় পুরুষের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায়। ডক্টর কানিনের লিপিবদ্ধ করা আরও একটি উদাহরণ হলো—

> 'একটি ১৮ বছরের মেয়ে তার মায়ের বাড়িতে জনৈক বোর্ডারের সাথে তিন মাস ধরে যৌনসংগম করেন। বিষয়টি তার মা ও অন্যান্য বোর্ডারের নজরে এলে তারা লোকটিকে বাসা থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। সেই অষ্টাদশী তরুণী যখন জানতে পারে তার সঙ্গী চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাক্স প্যাঁটরা গোছাচ্ছে, সে তার রুমে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং বলে—সেও তার সাথে এক ঘণ্টার মধ্যে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। লোকটি বলে—তোমাকে কে নিতে চাইছে! এরপর মেয়েটি তার সাথে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে এবং সোজা পুলিশ স্টেশনে গিয়ে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা ঠুকে দেয়। পলিগ্রাফ তদন্তে সে মিথ্যা অভিযোগের কথা স্বীকার করে।'

তিন. মিথ্যা ধর্ষণ মামলার ১৮% মনোযোগ আকর্ষণ এবং সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যেও হয়ে থাকে। ডক্টর কানিন জানাচ্ছেন—'৪১ বছরের একজন বিবাহিত মহিলা তার ডিভোর্সের পর যার কাছে কাউন্সেলিং নিচ্ছিলেন, তার থেকে অনেক বেশি মনোযোগ এবং সহানুভূতি পেতে চেয়েছিলেন। কেননা, তিনি তাকে পছন্দ করতেন। শেষমেশ মহিলাটি তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের নাটক সাজান এবং পুলিশ স্টেশনে গিয়ে যথারীতি মামলা করেন। অবশেষে সেই মহিলাকে পলিগ্রাফ তদন্তে নেওয়া হলে সে নিজের মিথ্যা অভিযোগ স্বীকার করে নেয়।'

কানিনের গবেষণা প্রমাণ করে যে, মামলায় সাক্ষী ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ণয় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ধর্ষণ মামলার সমাধানের জন্য নয়; বরং আদৌ কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি না, সেটা যাচাই করার

জন্যও এটা সমরূপ প্রয়োজনীয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে এই কাজের জন্যই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এটা ভিক্টিম ব্লেমিং নয়; নেহায়েতই কাণ্ডজ্ঞানের ব্যাপার। মনে রাখবেন, দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে নির্দোষ গণ্য করা যাবে; কিন্তু নির্দোষিতা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না।

আমরা এফবিআইয়ের ধর্ষণ মামলায় গ্রেফতারকৃতদের পরিসংখ্যান এবং মিথ্যা ধর্ষণ মামলার ব্যাপকতার ওপর কানিনের গবেষণার বিষয়ে জানলাম। এবার এটাকে এফবিআইয়ের ধর্ষণ মামলার পরিসংখ্যানের সাথে তুলনা করা যাক। আবারও ১৯৯৫ ও ২০১৪ সময়কালের দিকে লক্ষ করুন। ওপরের তথ্য ব্যবহার করে আমরা বলতে পারি—১৯৯৫ সালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রতি ১,০০,০০০ জনে মাত্র ৬৩.২টি মামলা খুঁজে পায়, যেগুলো অপরাধীদের গ্রেফতার করার মতো বিশ্বাসযোগ্য ছিল। এই সংখ্যাটি কিন্তু ব্যুরো অব জাস্টিসের নিজস্ব পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ধর্ষণের ন্যূন প্রতিবেদন (আন্ডার রিপোর্টিং) সংশোধন করার পর। একই পদ্ধতি ব্যবহার করে ২০১৪ সালে অপরাধী গ্রেফতার করার মতটি বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত করলে প্রতি ১,০০,০০০ জনে ৪৮.৬টি ধর্ষণের মামলার সন্ধান পাওয়া যেত। কানিনের গবেষণাকে যখন এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন দেখা যায়—এ সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৪১%-কে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল। কেন এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ?

এটা জরুরি। কেননা, কোনো যৌক্তিক দাবি ছাড়াই ধর্ষণের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে অসংখ্য পুরুষের জীবন ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে কাউকে কাউকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে আত্মহত্যার দিকে। নিচের উদাহরণগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন, এগুলো মোটেই অত্যুক্তি নয়।

১৯৫৫ সালে মিসিসিপির এমমেট লুইস টিল নামের ১৪ বছরের এক আফ্রো-আমেরিকান বালককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। কারণ, ক্যারোলিন ব্রায়ান্ট নামে একজন বিবাহিত নারী অভিযোগ করেছিল, সে তার উদ্দেশ্যে শিস বাজিয়েছে এবং যৌন হয়রানির চেষ্টা করেছে। অতঃপর ব্রায়ান্টের স্বামী এবং আরও কয়েকজন মিলে টিলকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং নিষ্ঠুর অত্যাচারের পর হত্যা করে।

ছয় দশক পরে ক্যারোলিন ব্রায়ান্ট প্রোফেসর টিমোথি বি টাইসনের *The Blood of Emmett Till* বইয়ে স্বীকারোক্তি দেয়—টিলের ওপর করা তার যৌন হয়রানির অভিযোগটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। অথচ ব্রায়ান্টের এই সহজ মিথ্যাটির কারণেই স্থানীয় গুপ্তঘাতকদের হাতে ১৪ বছরের নির্দোষ শিশুটিকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

২০০৯ সালে কিয়ো নামের একজন চিকিৎসারত মানসিক রোগীর বিরুদ্ধে অপর একজন রোগী ধর্ষণের অভিযোগ করে। ২০০৯ সালের ১লা জুলাই পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়। জেরা ও তদন্তের ওপর ভিত্তি করে পুলিশ ২০০৯ সালের ৪ জুলাই কিয়োকে অভিযুক্ত ব্যক্তির তালিকা থেকে বাদ দেয়। কিন্তু নিজের নির্দোষিতার ব্যাপারে কিছুই জানতে পারেনি কিয়ো। মিথ্যা অভিযোগের লজ্জা, গ্লানি আর ক্ষোভে শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। ২০০৯ সালের ৭ জুলাই হাসপাতালের বাথরুম থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

২০০৯ সালের ১০ জানুয়ারি WRCB TV প্রতিবেদন প্রকাশ করে—একজন মহিলা জর্জিয়ার ডালটন শহরের ১০ বছরের ঝানু পুলিশ অফিসার রবার্ট পল স্পার্কসের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেছে। এর আগে অফিসার স্পার্কস মদের দোকান অয়েস্টারে একটি মারামারির ঘটনা মোকাবিলা করেছিলেন। অভিযোগকারী নারীও সেই মারামারিতে জড়িত ছিল। স্পার্কস সেই নারীর আইডি কার্ড দেখতে তার হোটেল Guest Inn-এ যায়। সেই নারী এরপর তাকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। কিন্তু যখন তাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়, সে উভয়ের সম্মতিতেই যৌন সম্পর্ক স্থাপনের কথা স্বীকার করে নেয়। অফিসার স্পার্কসকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে অবগত করার জন্য পুলিশ স্টেশনে ডাকা হয়। কিন্তু নিজের নির্দোষ হওয়ার বিষয়টি জানার আগেই সে পুলিশ স্টেশনের বাথরুমে মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করে।

ডালটন পুলিশ অধিদপ্তর নিম্নোক্ত বিবৃতি দেয়—২০০৯ সালের ১০ জানুয়ারিতে প্রতিবেদন দায়ের করা একটি ধর্ষণ মামলায় তারা ডালটন পুলিশ অধিদপ্তরের মৃত অফিসার পল স্পার্কসের অপরাধের কোনো প্রমাণ পায়নি। জেলা অ্যাটোর্নি অফিস আরও জানায়—যদিও এটা সুস্পষ্ট যে, অভিযোগকারী নারী তদন্তকারীদের নিকট মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছে, কিন্তু এজন্য তাকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করার পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই। রাত প্রায় ৩টার দিকে অভিযোগকারীর দুজন বন্ধু তাকে তার হোটেলে কান্নারত ও বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখতে পায়। তার সাথে কথা

বলার পর রাত ৩টা ২২-এ তার একজন বন্ধু ৯৯৯-এ ফোন করে উক্ত পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে ধর্ষণ অভিযোগের রিপোর্ট করে। দায়িত্বরত সুপারভাইজিং পুলিশ সার্জেন্ট ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে। মহিলাটির বন্ধু সার্জেন্টকে বলে যে, ডালটন পুলিশ অফিসার অভিযোগকারী নারীকে ধর্ষণ করেছে; কিন্তু মহিলা শুধু তাদের যৌনসংগমের কথাই উল্লেখ করে।

রাত ৩টা ৫৫-তে গোয়েন্দা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় ৪টার দিকে বদলি সুপারভাইজার অফিসার স্পার্কসকে ৩০১ জোনের পুলিশ পরিষেবা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে অন্য আরেকজন অফিসারের সাথে অপেক্ষা করার নির্দেশ দেয়। অফিসার স্পার্কস ভোর ৪টা ১৪ মিনিটে সেখানে উপস্থিত হয়। প্রায় ৪টা ২৫-এর দিকে হুইটফিল্ড কান্ট্রি শেরিফ অফিসের একজন মহিলা ডেপুটি অভিযোগকারীকে ঘটনাস্থল থেকে Sexual Assault Nurse Examiner (SANE) দ্বারা পরীক্ষা করানোর জন্য হ্যামিলটন মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যায়। এরপর যখন বিভাগের কমান্ড স্ট্যাফের সদস্যরা ধর্ষণের মামলা নিয়ে আলোচনায় মগ্ন, সে সময় প্রায় ৫টা ৩০-এর দিকে অফিসার স্পার্কস বাথরুমে যাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে সেখান থেকে বের হয়।

আনুমানিক ভোর ৫টা ৪০-এর দিকে অফিসার স্পার্কস পেট্রোল ডিভিশনের বাথরুমে তার ডিপার্টমেন্টের ইস্যু করা সিগ ৪০-ক্যালিবার পিস্তল দিয়ে নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করে। হ্যামিলটন মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার পর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মামলার তদন্তকারীরা অফিসার স্পার্কসের সাথে কথা বলার কোনো সুযোগই পায়নি এবং স্পার্কস অভিযোগ সম্পর্কে তাদের বিস্তারিত কিছু বলেওনি।

এদিকে হ্যামিলটন মেডিকেল সেন্টারে একজন SANE নার্স নিরীক্ষণের আগে অভিযোগকারীকে জেরা করে। সে তখন নার্সকে বলে—অফিসার স্পার্কসের সাথে সে যৌনসংগমে লিপ্ত হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে। পরদিন সকালে জিবিআই ও ডিপিডি-এর অ্যাজেন্টরা তাকে আবারও জেরা করে এবং অভিযোগকারী পুনরায় বলে—অফিসার স্পার্কস যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোনোভাবেই তাকে ভয়, আদেশ বা জোরজবরদস্তি করেনি। তদন্তের অংশ হিসেবে SANE নার্স সেক্সুয়াল এজল্ট কিট প্রস্তুত করে ত বিশ্লেষণের জন্য জিবিআই ক্রাইম ল্যাবে পাঠায়। ডিপিডি ও জিবিআই-এর তদন্তকারীদের একাধিক জেরায় অভিযোগকারী ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে। কিন্তু তদন্তের গোটা সময়জুড়ে তার একটি কথা অপরিবর্তিত ছিল—তাদের যৌনসংগম ছিল পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে।

জিবিআই ক্রাইম ল্যাবে সেক্সুয়াল কিটের তদন্ত করার পর পুরুষের ডিএনএর উপস্থিতি চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে ডিএনএ না থাকায় সেটা কার, তা নির্ণয় করা যায়নি। ক্রাইম ল্যাবের কেমিস্ট বলেছিল—যৌনসংগমের নমুনাটি পুরাতন হওয়ার জন্য অথবা পুরুষ সঙ্গীর কোনো একসময় বন্ধ্যাত্ব থাকার কারণে এমনটা হতে পারে। জানা যায়, ২২ বছর আগে অফিসার স্পার্কসের বন্ধ্যাত্ব ছিল। জিবিআই ক্রাইম ল্যাবের অন্যান্য নিরীক্ষণ যেমন : স্পার্কস ও অভিযোগকারীর ডিএনএ টেস্ট, চুলের নমুনা থেকে প্রাপ্ত প্রমাণাদিতে যৌনসংগম ঘটেছিল—এমন কোনো প্রমাণ দিতে পুলিশ ব্যর্থ হয়। ডিসট্রিক্ট অ্যাটোর্নির অফিস শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে আসে—এই মামলার শারীরিক নমুনা থেকে যৌন মিলনের পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, আবার যৌন মিলন হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়েও দেওয়া যায় না।

আরও বলা হয়—অফিসার স্পার্কসের দ্বারা ধর্ষণের এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যা OCGA 16-6-1 ধারাকে লঙ্ঘন করে। এই ধারার সংজ্ঞানুযায়ী ধর্ষণ হলো একজন নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে যৌন মিলন। তারা বলে—একজন আইন প্রয়োগকারী অফিসার হিসেবে স্পার্কসের দিক থেকে প্ররোচনা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সেটা কোনোক্রমেই অভিযোগকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিল না।

ডেইলি মলের ২০১০ সালের ২ জুনের প্রতিবেদন অনুযায়ী ওলুমাইড ফাদাইমি নামে ২৭ বছরের একজন লোককে এক ব্রিটিশ নারীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। জনাব ফাদাইমি বলেন—এই মামলার কারণে তিনি তার বাড়ি, কাছের বন্ধুবান্ধব, চাকরি—সবই হারিয়েছেন। শেফিল্ড ক্রাউনের বিচারক প্যাট্রিক রবার্টশ তাকে নির্দোষ ঘোষণা করার পূর্বে মাত্র ৪৫ মিনিট যাবৎ তার বিচারকার্য চলছিল। তার চেয়েও ভয়ংকর তথ্য হলো—জনাব ফাদাইমির বিরুদ্ধে আদালতের বিচার পক্ষপাতমূলক বলে বিচারক রবার্টশ উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। যেই মহিলা জনাব ফাদাইমির বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা করেছিল, অতীতেও তার ধর্ষিত হওয়া সম্পর্কে মিথ্যা বলার প্রমাণ পাওয়া যায়। চার বছর পূর্বে সে ড্যানিয়েল ডেভেনি নামের ২১ বছরের একজন লোকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিল। ১৮ মাস পর সেই লোককে গ্রেফতার করা হলে সে আত্মহত্যা করে। নিরপরাধ থাকা সত্ত্বেও দুঃখজনকভাবে ডেভেনি ও ফাদাইমি উভয়েই ছিলেন একজন কুটিল মহিলার মিথ্যাচারের ভুক্তভোগী।

২০১৩ সালের জানুয়ারিতে ১৮ বছর বয়সি লুক হারউডের হত্যা সম্পর্কে টেলিগ্রাফ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। অ্যালিস হল তার বিরুদ্ধে পুলিশের নিকট মিথ্যা ধর্ষণের অভিযোগ করেছিল। তদন্ত করার পর পুলিশ বলে—সে একদমই ধর্ষিত হয়নি; বরং ধর্ষিত হওয়ার মিথ্যা নাটক সাজিয়েছিল মাত্র। মামলা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পর হলের বোন এমা ও তার চারজন বন্ধু মিলে নিষ্ঠুরভাবে পিটিয়ে হারউডকে হত্যা করে। অথচ লুক হারউড নিরপরাধ ছিলেন।

২০১৪ সালের মার্চে *ডেইলি মল* খবর প্রকাশ করে—পয়েন্টন হাই স্কুল এবং পারফর্মিং আর্টস কলেজে টম অ্যাক্টন নামে ১৬ বছরের এক বালককে জোর করে মাদক সেবনের জন্য তার সহপাঠীরা নির্যাতন ও নিপীড়ন চালায়। অ্যাক্টন বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়কদের এ বিষয়ে রিপোর্ট করলেও তারা এই ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। সহপাঠীদের প্রতিনিয়ত এমন অত্যাচারের কারণে বাধ্য হয়ে তার মা তাকে বিদ্যালয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখে। এদিকে গুজব রটে—সে একটি মেয়েকে গাছের সাথে বেঁধে রেখে ধর্ষণ করেছে এবং সেটার ছবিও তুলে রেখেছে। গুজবটি সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং ৩০ জনেরও বেশি কিশোরের দল এসে টমকে বেধড়ক পিটিয়ে যায়। সে এত বেশি হতাশ হয়ে পড়ে যে, নিজের পায়ের মধ্যে নিজেই ধর্ষক লিখে খোদাই করে। কিছুক্ষণ আগেই এক আক্রমণকারী কিশোর টমের গলায় ছুরি ধরেছিল। তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার আগেই টমকে বাথরুমে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। সে আত্মহত্যা করেছিল।

পরবর্তী সময়ে থমাস গ্রিনউড নামের এক আক্রমণকারী টমের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল বলে আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। টমের আত্মহত্যা করার কারণ একটাই—তার ওপর মিথ্যা ধর্ষণের অভিযোগ এবং শারীরিক লাঞ্ছনা। অথচ প্রকৃতপক্ষে টম অ্যাক্টনের কোনো অপরাধ ছিল না।

চোখের সামনে এত সব তথ্য থাকার পর RAINN বা অন্যান্য সংস্থা যখন দাবি করে ১৬% থেকে ২৫% নারীই ধর্ষণের শিকার, আমি সেটা বিশ্বাস করতে পারি না। বিশেষত যেখানে আমেরিকার সরকার বলছে, ধর্ষণের শিকার নারীর হার এক শতাংশেরও নিচে। কিন্তু নারীবাদীরা এই হার ৮০ গুণেরও বেশি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করে।

অধিকন্তু 'পুরুষরা ধর্ষণের একটি কালচার গড়ে তুলেছে'—এই ভ্রান্ত তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে নারীবাদীদের প্রায়শই বেশ চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করতে দেখা যায়।

অথচ RAINN-এর মতো সংগঠনও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, ধর্ষণ সংস্কৃতির তত্ত্বটি ছিল ভুয়া। ২০১৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি RAINN-এর প্রেসিডেন্ট স্কট বার্কোভিটস এবং পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট রেবেকা ওকনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা সম্পর্কিত অধিদপ্তর White House Task Force to Protect Women from Sexual Assault-এ একটি চিঠি লেখেন। বার্কোভিটস ও ওকনার টাস্ক ফোর্সের নিকট লেখা তাদের চিঠিতে স্বীকার করেন—

> 'বিগত কয়েক বছর ধরে ক্যাম্পাসগুলোতে যৌন সহিংসতা চরমভাবে বেড়ে যাওয়ায় রেপ কালচারকে দোষারোপ করার একটি দুঃখজনক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক কারণে ধর্ষণ সংঘটিত হয় না; বরং সহিংস অপরাধ করার উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সচেতন সংকল্পের ফলে ধর্ষণ সংঘটিত হয়ে থাকে।'

শুধু বিরোধীরাই নয়, পুরুষের ধর্ষণ কালচারের ধারণাকে নারীবাদীদের একটি অংশও সম্পূর্ণভাবে রদ করেছে। তবে এটা সুস্পষ্ট যে, এরপরও নারীবাদীরা যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণের সংখ্যা অসাধুভাবে বাড়িয়ে তুলতে এই সংস্কৃতির অস্তিত্ব সম্পর্কে ক্রমাগত মিথ্যাচার চালিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত বাস্তবতা যখন পুরোপুরি তাদের বিপক্ষে চলে গিয়েছে, নিজেদের সুবিধার জন্য তারা পুরো পদ্ধতিটাই বদলে দিয়েছে। কয়েক দশক ধরে নারীবাদীরা তাদের সপক্ষে জনমত পাওয়ার জন্য পক্ষপাতমূলক জরিপ দেখিয়ে ধর্ষণের বানোয়াট সংজ্ঞাটি ব্যাপকভাবে প্রচার করেছে। এখনও করে চলেছে। এই সংজ্ঞার আওতায় বেশির ভাগ যৌন সম্পর্ক পারস্পরিক সম্মতিতে হলেও সেগুলোকে ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়। নারীবাদীদের অন্যতম মুখপাত্র ক্যাথরিন ম্যাকিনন বলেন—

> 'যখন একজন নারী যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় এবং দমিত অনুভব করে, আমি সেটাকে ধর্ষণ বলে অভিহিত করি। সকল নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্কই ধর্ষণ। কেননা, নারীরা ইঙ্গিতপূর্ণ সম্মতি জানানোর জন্য যথেষ্ট দৃঢ় নয়।'

ম্যাকিননের কাছে একজন নারী আদতেই ধর্ষিত হয়েছে কি না, সেটা বিবেচ্য নয়; বরং সে দমিত অনুভব করামাত্রই সেটা ধর্ষণ! এমনকি দমিত অনুভব না করলেও কোনো নারীর যৌন সম্পর্ককে ধর্ষণ বলা হবে। কেননা, নারীরা দুর্বল লিঙ্গ হিসেবে সম্মতি দিতে পারে না। এ ধরনের ভারসাম্যহীন প্রলাপ বকার পরও তাকে লিঙ্গবৈষম্যকারী বলা নিশ্চয়ই অসংগত নয়? অপর এক নারীবাদী ক্যাথরিন কমিনস বলেন—

'যেসব পুরুষকে অন্যায়ভাবে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়, তারা কখনো কখনো তাদের অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হতে পারেন।'

কী উদ্ভট মন্তব্য! মিথ্যা ধর্ষণের অভিযোগে নিরপরাধ পুরুষরা নির্মমভাবে নির্যাতিত ও হত্যার শিকার হয়ে কীভাবে লাভবান হতে পারে? এরা মূলত ভয়ংকর নিষ্ঠুর আর হৃদয়হীন; আগাগোড়া ঘৃণাজীবী গোঁড়ামিপূর্ণ লোক।

২০১৪ সালের ১৬ জানুয়ারি নর্থ ক্যারোলাইনার ছাত্র-ছাত্রীদের অফিসিয়াল পত্রিকা *Technician*-এর স্ট্যাফ কলামিস্ট নিকি ভট লেখেন—'ধর্ষণ মূলত কী এবং কীভাবে সেটি সংঘটিত হয়—পুরুষ হিসেবে নারীদের তা বলার কোনো অধিকার আমাদের নেই। পুরুষ হিসেবে আমাদের ভূমিকা হলো চুপচাপ থাকা এবং অন্যদের ধর্ষণ করা থেকে বিরত থাকা।'

পরিশেষে আমরা রবিন মরগ্যানের কথা বলব। একসময়ের বিখ্যাত এই নারীবাদী অ্যাকটিভিস্ট বলেছিলেন—'আমি জোর দিয়ে বলছি, যে যৌন সম্পর্ক নারীরা নিজেরা আরম্ভ করে না, সেটাকেই ধর্ষণ বলা হবে।'

বিশ্বব্যাপী ফেমিনিস্ট মুভমেন্টে এ নারীবাদী অ্যাকটিভিস্টদের মূল প্রবক্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এদের সবার কাছেই সাধারণ ব্যাপার হলো—বেশির ভাগ যৌন সম্পর্ক পরস্পর সম্মতিতে হলেও সেটা ধর্ষণ।

আপনারা সুস্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছেন, নারীবাদীদের প্রদত্ত ধর্ষণের সংজ্ঞা আইনগত সংজ্ঞার ধারেকাছেও পড়ে না। নারীবাদীরা দীর্ঘ সময় ধরেই এই বিষয়ে অবগত। কিন্তু গোঁড়ামিপূর্ণ সংজ্ঞাটি সংশোধন করার পরিবর্তে তারা বরং কোর্ট ও কলেজগুলোকে স্বতন্ত্র সিভিল রেপ ট্রাইবুন্যাল প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছে, যেন দলিল-প্রমাণ কম থাকলেও যে কাউকে মিথ্যা ধর্ষণ মামলায় সহজেই অভিযুক্ত করা যায়। এটা স্রেফ পুরুষদের হয়রানি করা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

এর ফলে পুরুষদের বিচারকার্যের অধিকার, আইনজীবী নিয়োগের অধিকার, যৌক্তিকভাবে যুক্তি খণ্ডনের অধিকার এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—তাদের নীরব থাকার সাংবিধানিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। মিথ্যা ধর্ষণ মামলার বিরুদ্ধে ন্যায়সংগত উপায়ে পুরুষরা যেন নিজেদের রক্ষা করতে না পারে, সেজন্যই আইন ও ন্যায়বিচারবর্জিত এই আদালতগুলোর আবির্ভাব। দুঃখজনক ব্যাপার হলো—নারীবাদীরা সত্যি সত্যিই সিভিল রেপ ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, যা নামমাত্র প্রমাণাদি কিংবা কোনো প্রমাণ ছাড়াই নারীদের ধর্ষণের

মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করার অবাধ স্বাধীনতা ও ক্ষমতা প্রদান করেছে। এসব আদালতে একজন নারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট অভিযোগ করা ছাড়াই কোনো পুরুষের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তুলতে পারে।

আইন ও ন্যায়বিচারবর্জিত এই আদালতগুলো অভিযুক্ত ব্যক্তির যথাযথ সাংবিধানিক অধিকার এবং প্রতিরক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ না করে প্রায়ই তাকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। সেখানে ধর্ষণের অভিযোগের কোনো রকম আলাদা তদন্ত সম্পাদন করা হয় না। শুধু অভিযোগকারী নারী কর্তৃক অভিযুক্ত ধর্ষকের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সংঘটিত হয়। যদিও-বা তদন্ত করা হয়, তদন্তকারীরা কেবল নিজেদের মতের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়। এদের অধিকাংশই আবার উপযুক্ত অপরাধ তদন্ত কৌশলের ওপর সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়। এমনকি অনেক অভিযোগের ক্ষেত্রে পুলিশের কাছে রিপোর্টও করা হয় না। বেশির ভাগ তদন্তকারী ও বিচারকই নারীবাদী মতাদর্শের। অধিকন্তু প্রায়ই নারীবাদী উকিলরা ফেমিনিস্ট মানদণ্ডের অধীনে ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগকারীর পক্ষে আদালতে প্রতিনিধিত্ব করে।

গ্রান্ট নেইল একজন শ্রেষ্ঠ কলেজ ক্রীড়াবিদ এবং পুয়েবলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। পরস্পর সম্মতিতে সে তার প্রেমিকার সাথে একবার যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। তথাপি তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তদন্ত শুরু করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এই তদন্তের ক্ষেত্রে তারা সিভিল আদালতের মানদণ্ড তো অনুসরণ করেইনি, উলটো পদে পদে অনুসরণ করেছে ফেমিনিস্ট বাটখারা। তদন্তের পুরো সময়জুড়েই তার প্রেমিকা দৃঢ়তার সাথে সাক্ষ্য দিয়ে গেছে—নেইল তাকে ধর্ষণ করেনি, তাদের উভয়েরই সম্মতি ছিল তাতে। এরপরও কলেজ কর্তৃপক্ষ নেইলকে দীর্ঘ সময়ের জন্য বহিষ্কার করে। লোকটি ধর্ষণ করেনি—খোদ সঙ্গিনী সেই সাক্ষ্য দেওয়ার পরও এই উগ্র নারীবাদী চক্র একজন প্রতিভাবান তরুণের অ্যাকাডেমিক ও অ্যাথলেটিক ক্যারিয়ার ধসিয়ে দিয়েছে। কী ভয়ংকর ব্যাপার!

সেলিব ওয়ার্নার নর্থ ডাকোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়র এবং সামাজিক ভ্রাতৃত্ব গ্রুপ 'ফি ডেল্টা থেইটা'র একজন সদস্য। ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে এক তরুণীর সাথে তার পরিচয় হয়। অল্প কিছুদিন পরই তারা উভয়ের সম্মতিতে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। পরদিন সকালে তরুণীটি তাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে সম্পর্কে জড়াতে অস্বীকৃতি জানায় ওয়ার্নার। কিছুক্ষণ পরেই তরুণী তাকে মেসেজ পাঠিয়ে বলে—তার সাথে আর কখনোই

যোগাযোগ না করতে। এরপর সে ভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে জানায়, ওয়ার্নার তাকে ধর্ষণ করেছে এবং শুধু এই অভিযোগের ওপর ভিত্তি করেই কলেজ থেকে ওয়ার্নারকে বহিষ্কার করা হয়।

২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয় শুনানি। ওয়ার্নারের পক্ষে একজন আইনজীবী থাকলেও তিনি তার হয়ে বা অভিযোগকারী মেয়ের কথার বিপরীতে কথা বলার কোনো অনুমতিই পাননি। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে ধর্ষণের অভিযোগে তিন বছরের জন্য কলেজ থেকে বহিষ্কার করে। বিষয়টি জানতে পেরে অপরাধ তদন্ত শুরু করে গ্রান্ড ফোর্কসের পুলিশ অধিদপ্তর। একসময় তারা নিশ্চিত হয়, অভিযোগটি ছিল আগাগোড়া বানোয়াট। ২০১০ সালের মে মাসে ওই তরুণীকে মিথ্যা অভিযোগের দায়ে নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের নিকট হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পরপরই সে নর্থ ডাকোটা শহর ত্যাগ করে; এরপর আর কখনোই ফিরে আসেনি। আইনের চোখে এখনও সে পলাতক আসামি। ঠাট্টার বিষয় হলো—পুলিশ ওয়ার্নারের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করলেও করিতকর্মা কর্তৃপক্ষ তাকে কলেজে পুনর্বহাল করেনি।

ওপরের ঘটনাগুলো এমন আরও বহুসংখ্যক ঘটনার সামান্য কিছু উদাহরণ। এই সকল মামলায় পুরুষদের আইনজীবী এবং সমকক্ষ জুরি নিয়োগের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। প্রায় সময়েই নারীর অভিযোগের সাথে পুরুষের বক্তব্যের সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। অধিকন্তু, যদি সিভিল রেপের আওতায় পুরুষটিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে সে ব্যক্তিগত বন্দুক ব্যবহারের সাংবিধানিক ক্ষমতা হারায়। শুধু তা-ই নয়, অভিযোগকারীর গর্ভে সন্তান জন্ম নিলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার ভরণ-পোষণের ভার পড়ে অভিযুক্তের ওপর। সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেও অবশ্য সন্তান প্রতিপালনের অধিকার সে পায় না। সন্তান প্রতিপালিত হতে থাকে একজন তত্ত্বাবধায়কের কাছে।

সারা বিশ্বে নারীবাদীদের মিথ্যা অভিযোগ পুরুষদের জীবন ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। নিরীহ পুরুষদের এই মিথ্যাচারের মূল্য চুকাতে হয়েছে—হয়তো অন্যায়ভাবে কারাবরণ করে, নয়তো আত্মহননের মধ্য দিয়ে। যদিও গণহারে ধর্ষণের এই বিষয়টি ফেমিনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম গুরুতর এবং অনর্থক একটি মিথ্যাচার।

পারিবারিক সহিংসতার মিথ্যাচার

পারিবারিক সহিংসতার প্রসঙ্গ এলেই প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে—একজন পুরুষ তার স্ত্রীর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছে আর তাদের বাচ্চা ঘটনাস্থলের অন্যপাশ থেকে সেটা দেখে কান্না করছে। যদিও এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক একটি দৃশ্য, কিন্তু এই একটি দৃশ্য নিয়েই নারীবাদীরা প্রায় ৫০ বছর ধরে তাদের ধান্দাবাজি চালিয়ে আসছে। প্রকৃতপক্ষে যখন নারীবাদীরা পারিবারিক সহিংসতার কথা উল্লেখ করে, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তারা সমর্থন ও সহানুভূতি লাভের জন্য উপরিউক্ত ঘটনার মতো কোনো করুণ কাহিনি ফেঁদে বসে। এটা নিয়ে তারা এত পরিমাণ জাবর কেটেছে যে, সম্পূর্ণ আবেদন হারিয়ে বিষয়টি হয়ে উঠেছে নিতান্ত হাস্যকর আর অর্থহীন। সে কথা মাথায় রেখে একজন পারিবারিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা যাক; যিনি মিডিয়ায় যৎসামান্য হলেও আলোচিত হতে পেরেছিলেন।

একবার ওয়াশিংটনের রেভেনসডেলের বাসিন্দা ডেসিরি র‍্যান্টস অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে খুন হন। সাধারণত বন্ধুবান্ধবের বাচ্চাকাচ্চাদের দেখাশোনা করতেন ডেসিরি। ইচ্ছে ছিল নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়ার। পরিবারের কাছাকাছিই থাকতেন। খুন হওয়ার সময় তিনি ছিলেন নিজের ভাইয়ের বাসায়। এ রকম গল্প তো আমরা প্রায়শই শুনে থাকি। তাহলে ডেসিরির ঘটনার ভিন্নতাটা কী? বিস্ময়কর ভিন্নতাটা হলো—তিনি খুন হয়েছিলেন Federal Way Domestic Violence Task Force-এর প্রাক্তন নারী সভাপতি লরেইন নেদারটনের হাতে! কিং কাউন্টি জার্নালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ঘটনাটি ছিল এ রকম—

২০০২ সালের এক শুক্রবারে নেদারটন ৯১১-তে ফোন করে বলেন—'তি
শিশু অপহরণকারীদের খোঁজ পেয়েছেন।' পাঁচ মিনিট পরই তার কলটি বিচ্ছি
হয়ে যায়। খানিক বাদে আবারও ৯১১-এ ফোন আসে। এবারে নেদার
বলেন—'তিনি যাকে খুঁজছিলেন, তাকে গাড়ি চালানো অবস্থায় গুলি করেছে
তার দাবি অনুযায়ী গুলিটা তিনি করেছিলেন অপহরণকারীর আক্রমণ থেকে
নিজেকে আত্মরক্ষার স্বার্থে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে নেদারটনের কাছে দুটি
বন্দুক দেখতে পায়; নয় মিলিমিটারের সেমি অটো হ্যান্ডগান ও ০.৩
ম্যাগনামের রিভলভার। এরপর নেদারটন ইতঃপূর্বে ৯১১ নম্বরে ক
অপহরণের কাহিনি বদলে সম্পূর্ণ নতুন এক গল্প ফাঁদে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের
বর্ণনায় আসল ঘটনা হলো—

'ডেসিরি তার বন্ধু উইলিয়ামের সন্তানকে নিয়ে স্কুল থেকে বাসায় ফিরছিল। এ
সময় নেদারটন ও উইলিয়ামের প্রাক্তন স্ত্রী গোয়েন একটি গাড়িতে করে তাদে
পিছু নেয়। উইলিয়াম তার সন্তানসহ বাসার ভেতরে প্রবেশ করে। ডেসিরি
তাদের পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে নেদারটন তাকে লক্ষ্য করে গুলি
ছোড়ে। প্রথম গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এরপর গাড়ির কাছে গিয়ে সরাসরি
ডেসিরির বুকে গুলি করে নেদারটন। ডেসিরির নিথর দেহ মাটিতে লুটিয়ে
পড়লে সে আরও দুবার গুলি চালায়। ঘটনাস্থল থেকে নয় মিলিমিটার বন্দুকের
কয়েকটি কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ।

পরবর্তী তদন্তে ডেসিরির সাথে নেদারটনের সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কোনো প্রমাণ
খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ ইচ্ছাকৃত খুনের দায়ে নেদারটনকে গ্রেফতার
করে। অথচ বিচার শেষে পাঁচ লাখ ডলার মুচলেকা এবং ২০ বছরের কারাদণ্ড
দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আদালত ঘোষণা করে—এটি নিছকই একটি অনিচ্ছাকৃত
হত্যাকাণ্ড! পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নেদারটন ছিলেন Federal Way
Domestic Violence Task Force-এর প্রাক্তন নারী সভাপতি। এমন হিংস্র
স্বভাবের জন্যই সকল সদস্যদের ভোটে সংস্থা থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কৃত
হয়েছিল সে। আরও গুরুত্বপূর্ণ খবর হলো—ডেসিরিই নেদারটনের বন্দুক
হামলার প্রথম শিকার নয়।'

১৯৮৮ সালে থিওডোর চোমিন নামের এক ব্যক্তিকেও গুলি করেছিল এই অত্যুগ্র
মহিলা। নেদারটনের ভাষ্যমতে, থিওডোরই নাকি প্রথমে ১৯৮৮ সালের ২৩
মার্চ রাত প্রায় ১টার সময় ওয়াশিংটনের আলাস্কা স্ট্রিটে একটি মদের দোকানের
বাইরে তার ওপর আক্রমণ চালায় এবং এতে তার কবজিতে ক্ষত সৃষ্টি হয়।

এরপর নেদারটন থিওডোরকে লক্ষ্য করে বন্দুক তাক করে এবং গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত গুলি করতে থাকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখে নেদারটনের হাতে ক্ষতের চিহ্ন খুবই সামান্য। এ ছাড়া তার পোশাক কিংবা শরীরে প্রবল ধস্তাধস্তির কোনো আলামতও ছিল না। পুলিশ নিশ্চিত করে, তার পোশাক পরিষ্কার এবং কোথাও ছিঁড়ে যাওয়ার চিহ্নমাত্র নেই।

অন্যদিকে থিওডোর বলেছিল—সে নেদারটনকে বাইরে চিন্তিত অবস্থায় দেখে সাহায্য করতে চেয়েছিল। নেদারটন সেটা শুনেই গালিগালাজ শুরু করে দেয় এবং অকস্মাৎ বন্দুক তাক করে গুলি ছুড়তে থাকে। নেদারটন মোট ছয়টি গুলি ছুড়লেও সৌভাগ্যবসত লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছিল কেবল একটি। বন্দুকের গুলি থিওডোরের লিভার এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। পরবর্তী সময়ে সার্জারি করতে হয়েছিল তাকে। সে সময় থিওডোর যদি এবড়ো-খেবড়ো দৌড়ঝাঁপ না করত, নিশ্চিতভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হতো সে। প্রাক্তন স্বামীর সাক্ষ্য অনুযায়ী, ২০ বছর বয়স থেকেই বন্দুক ব্যবহার করতে শুরু করে নেদারটন। সুতরাং এটা তার জন্য ডালভাতই ছিল বলা চলে।

ঘটনাটি এখানে প্রাসঙ্গিক। কেননা, এটি প্রমাণ করে—বাস্তবে শুধু পুরুষরাই নারীদের ওপর পারিবারিক সহিংসতা চালায় না, এই কাহিনির মতো একজন মাদকাসক্ত মা অথবা প্রাক্তন স্ত্রীও সহিংসতা চালাতে পারে। সমস্ত সংবাদমাধ্যম এবং প্রত্যেকেই একটি বিষয় সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছে যে, সেই শিশুটির মা ছিল নেদারটনের দুষ্কর্মের একজন সহকারী। কিন্তু আদালতে তাকে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়নি, অথচ সে-ই এই ঘৃণ্য অপরাধের ইন্ধনদাতা।

২০০৭ সালের মে মাসে জনস্বাস্থ্যবিষয়ক একটি আমেরিকান *পিয়ার রিভিউড জার্নাল* 'Differences in Frequency of Violence and Reported Injury Between Relationships with Reciprocal and Nonreciprocal Intimate Partner Violence' নামক একটি গবেষণা প্রকাশ করে। শুরুতেই লেখকরা সেখানে এ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী গবেষণাগুলো সম্পর্কে বলেন—'অনেকগুলো গবেষণা অনুসন্ধান করে পাওয়া যায়, নারী ও পুরুষরা তাদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বা সঙ্গিনীর ওপর অত্যাচার শুরু করে এবং তাদের উভয়ের অত্যাচারের হার প্রায় একই রকম।'

National Longitudinal Study of Adolescent Health-এর ১৮ থেকে ২৮ বছর বয়সি প্রায় ১১ জন অংশগ্রহণকারীর নমুনা থেকে তাদের গবেষণার তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার একটি তথ্য হলো—'সহিংসতাপূর্ণ সম্পর্কের প্রায়

৪৯.৭% ক্ষেত্রে উভয় দিক থেকে হিংস্র আচরণ লক্ষ করা যায়। পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশিসংখ্যক সহিংসতামূলক সম্পর্কের ব্যাপারে পুলিশ রিপোর্ট করেছিলেন, যেখানে একপাক্ষিক ও উভয়পাক্ষিক—দুই ধরনের সহিংসতাই ছিল।'

National Violence Against Women Survey-এর অনুসন্ধানকৃত তথ্যানুযায়ী, যে নারীরা সমকামী সঙ্গীর সাথে বসবাস করেন, তাদের ৩৫.৪ শতাংশ জীবদ্দশায় সঙ্গিনীর দ্বারা সহিংস আচরণের মুখোমুখি হন। অন্যদিকে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গীর সাথে বসবাসকারী নারীদের ক্ষেত্রে এই হার ২০.৪%। অর্থাৎ, ভিন্ন লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট নারীদের চেয়ে সমকামী নারীরা ৭৫% বেশি পারিবারিক সহিংসতার শিকার। এ ছাড়াও সমকামী নারীদের অপেক্ষাকৃত বেশি নিপীড়নের বিষয়টি নিশ্চিত করে ২০১০ ও ২০১৩ সালে পৃথক পৃথক দুটি প্রতিবেদন পেশ করে CDC National Intimate Partner and Sexual Violence Survey। এখানে একটি নীতি পরিষ্কার—সম্পর্কে জড়িত থাকাকালীন নারীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি সহিংস হয়ে থাকে। তাহলে পুরুষদেরই কেন সব সময় অত্যাচারী হিসেবে দেখানো হয়?

ঢালাও নারীবাদীরা সমাজে ব্যাপকভাবে এই মিথ্যাচার প্রচার করে, সকলে সেটা বিশ্বাসও করে। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো—নারীবাদীরা নিজেদের স্বার্থের জন্য একটি কর্পোরেট কুটির শিল্প তৈরি করেছে, যা তাদের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক উৎস। এর বাইরে পারিবারিক সহিংসতার নামে পুরুষদের হেনস্থা করার জন্য রয়েছে Duluth Model।

১৯৮৩ সালে হ্যামলিন ল রিভিউ বিখ্যাত নারীবাদী এলেন পেন্সের একটি কলাম প্রকাশ করে। 'The Duluth Domestic Abuse Intervention Project' নামের সেই কলামে পুরুষদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ আর জিঘাংসা ছড়িয়ে দেন পেন্স। এর আগে পারিবারিক সহিংসতা মোকাবিলায় একটি প্রোগ্রাম চালাতে বেশ মোটা অঙ্কের অর্থ অনুদান পেয়েছিলেন তিনি। তার অভিমত ছিল— পারিবারিক সহিংসতার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক লোককে গ্রেফতার করা হচ্ছে না। সে সময় আরও অনেক ফেমিনিস্ট তার এই অভিমত সমর্থন করে। যেকোনো অভিযুক্ত পুরুষমাত্রই দোষী—মোটাদাগে এটাই ছিল পেন্সের দৃষ্টিভঙ্গি।

এই ধারণা নিশ্চিতভাবেই লিঙ্গবৈষম্যমূলক এবং কোনোক্রমেই ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নয়। পেন্সের গোঁড়ামিপূর্ণ একপেশে ভাবকে সমর্থন করার জন্য তার পরবর্তী বিষয়বস্তু ছিল নিপীড়ক ও নিপীড়িতের মধ্যকার সম্পর্কের ধরন।

মনে রাখা দরকার, এই বিষয়টি বিবাহের বিরুদ্ধে নারীবাদীদের পুরোনো লড়াইয়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। পেন্সের পরিকল্পনা ছিল নারীদের পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করার দায়িত্ব অন্য কাউকে দেওয়া।

১৯৮০ সালে সেই উদ্দেশ্যেই 'Domestic Violence Intervention Project' (DAIP) গঠন করা হয়। সংস্থাটির প্রথম কাজ ছিল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আইনজীবী এবং আদালতে পারিবারিক সহিংসতার ধারণা সুবিধামতো বদলে দেওয়া। ফেমিনিস্টদের লিঙ্গবৈষম্যমূলক তত্ত্বকে সমর্থন করার জন্য পারিবারিক সহিংসতাকে একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতেন। এজন্য পারিবারিক সহিংসতাকে মূল অপরাধ হিসেবে না দেখে, তিনি দেখতে চাইতেন অপরাধের একটি উপসর্গ হিসেবে। এর পেছনে কারণ দেখাতে গিয়ে পেন্স বলেন—'নির্যাতনকে একটি উপসর্গ হিসেবে বিবেচনা করার সুবিধা হলো, কাকে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে—এটি তা চিহ্নিত করে দেয়।'

অন্য কথায়, পুরুষদের দায়ী করার জন্য পেন্সের কিছু সুযোগ দরকার ছিল। পারিবারিক সহিংসতার আলোচনা ক্রিমিনাল-ভিক্টিম-প্যারাডাইম থেকে সিন্ড্রোম বা উপসর্গ প্যারাডাইমে বদলে দেওয়ার ফলে সেই সুযোগ তার সামনে চলে আসে।

DAIP-কে এজন্যই একটি আন্তঃসংস্থা প্রকল্প হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। এটি পুলিশ বিভাগ, শহর কারাগার, জেলা অ্যাটর্নি অফিস, শিক্ষানবিশ বিভাগ, মহিলা আশ্রয়, চারটি কাউন্সেলিং অ্যাজেন্সি, মানব উন্নয়নকেন্দ্র, ডুলুথ পারিবারিক সেবা, লুথেরান সমাজসেবা এবং ডুলুথ কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত। Minnesota Program Development Inc নামে পরিচিত কতিপয় বেসরকারি সংস্থার অর্থায়নে এটার তদারকি করত একটি অলাভজনক বেসরকারি কর্পোরেশন। সেই অলাভজনক কর্পোরেশনটি DAIP-এর তিনজন বেতনভোগী কর্মচারীর মাধ্যমে তিন বছরের জন্য এই সংস্থাগুলোকে সমন্বয় করত। এসব তীব্র নারীবাদী প্রতাপ এবং তৎপরতার ফলস্বরূপ ১৯৮২ সালে পেন্সের মতাদর্শ মোতাবেক মিনেসোটার গ্রেফতার আইন বদলে দেওয়া হয়। পেন্সের মতে—

> 'অন্যান্য অপরাধের বিপরীতে একজন পুলিশ অফিসার প্রকৃতপক্ষে অপরাধমূলক আচরণ পর্যবেক্ষণ না করেই অপরাধীকে গ্রেফতার করতে পারবেন। আইন অফিসারকে সম্ভাব্য কারণ দেখিয়ে গ্রেফতারের সেই ক্ষমতা প্রদান করেছে। পারিবারিক সহিংসতার

ক্ষেত্রে যদি নির্যাতিত ব্যক্তির গায়ে বাহ্যিক ক্ষত কিংবা শারীরিক বিকলতার কোনো চিহ্ন দেখা যায়, তাহলে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই লিভ টুগেদারে থাকা যেকোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যাবে এবং সেটা করতে হবে অনূর্ধ্ব চার ঘণ্টার মধ্যে।'

মিনেসোটার এই আইন অনুযায়ী কোনো নারী যদি নিজেই নিজেকে আঘাত করে বা অন্য কোনোভাবে আহত হয়, তাহলে তার সঙ্গীকে বিনা দোষে গ্রেফতার করা খুবই সম্ভব। অধিকন্তু, কোনো নারীর ছুরিকাঘাতের বিপরীতে তার সঙ্গী যদি আত্মরক্ষার জন্য উলটো আঘাত করে, নিশ্চিতভাবেই সে পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগে ফেঁসে যাবে। লক্ষ করুন, পুরুষও যে নির্যাতনের শিকার হতে পারে—এই একচোখা আইনে সেটা বিবেচনাই করা হয়নি।

গ্রেফতারের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য DAIP কর্মীদের দাবির মুখে পুলিশের প্রতিক্রিয়া কী ছিল? পেন্স স্বীকার করেন, তিনি পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রচুর বাধার শিকার হয়েছিলেন। পুলিশ আশঙ্কা করেছিল, এটা একসময় আদেশমূলক গ্রেফতারে পরিণত হতে পারে, যেটা শেষ পর্যন্ত পুলিশের বিরুদ্ধে অহেতুক আইনি দায়বদ্ধতা তৈরি করবে। পরবর্তী সময়ে জেলা অ্যাটর্নির অফিস থেকেও একই আশঙ্কার কথা বিবৃত হয়। পেন্সের ভাষায় সেটা ছিল 'সরকারি নীতির নৈতিকতা'।

পুলিশ অফিসারদের সেই আশঙ্কা একদম সঠিক ছিল। বিশেষজ্ঞরা পরবর্তী সময়ে বারবার দেখিয়েছেন, পারিবারিক সহিংসতায় হস্তক্ষেপ করার মাধ্যম হিসেবে DAIP ছিল নিতান্তই অকার্যকর। উপরন্তু তারা আরও প্রমাণ করেন, এই সংস্থাকে কর্মে নিয়োজিত করার ফলেই গুরুতর প্রশ্ন উঠেছিল নৈতিক মানদণ্ড নিয়ে। আদেশমূলক গ্রেফতারকে পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়নের সময় এই নৈতিকতার খাতিরেই পুলিশ অফিসাররা প্রথমাবস্থায় বাধা দিয়েছিলেন।

এর জবাবে পেন্স বলেছিলেন—'এদের (পুলিশের) পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য আদায় করতে কিছু পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। প্রথমত, DAIP কর্মীরা পুলিশ কর্মকর্তাদের নিকট সমস্ত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে লিখিত প্রতিবেদন দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, গ্রেফতার বা তদন্ত প্রতিবেদন করা উচিত কি না, তা নির্ধারণ করার জন্য টহল বিভাগের পরিদর্শকগণ পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগ সম্পর্কিত সমস্ত ফোন রেকর্ড পর্যালোচনা করেছিল। অভিযোগের সম্ভাব্য কারণ খুঁজতে কমপক্ষে দুই মাস জেরা এবং সাক্ষাৎকারপর্ব চালাতে হয়েছিল সকল অভিযোগকারীর সাথে। এই

দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও তত্ত্বাবধায়নের কারণে গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। আবার যখন লম্বা সময় ধরে গ্রেফতারের হার হ্রাস পাবে, পুনরায় চালু করা হবে এই তত্ত্বাবধান।'

এই বিষয়ে একটু চিন্তা করে দেখুন, প্রতিবার যখন একজন পুলিশ অফিসার পারিবারিক সহিংসতার ফোনকলে সাড়া দিতেন, একজন DAIP নারীবাদী তাদের প্রতিক্রিয়ার সমালোচনা করে প্রতিবেদন লিখতেন। অধিকন্তু, টহল বিভাগের ইন্সপেক্টর পুলিশ অফিসারকে চাপ প্রয়োগ করত প্রতিটি পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে আসা ফোনকলের তদন্ত করার জন্য। সবশেষে DAIP নারীবাদীরা অভিযোগকারী নারীর সাথে নিজেরা যোগাযোগ করে লিখিত অভিযোগের ব্যাপারে উসকাতে থাকত। চিন্তা করুন, এ DAIP কর্মীদের না ছিল কোনো প্রশিক্ষণ, না ছিল কোনো ফরেনসিক তদন্তের অভিজ্ঞতা। এরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিল আর্টস থেকে স্নাতক আনাড়ি পুরুষবিদ্বেষী ফেমিনিস্ট।

পুলিশ অধিদপ্তর যেই মুহূর্তে তাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হলো, তখনই শুরু হলো মামাবাড়ির নতুন আবদার। সহিংসতার শিকার প্রতিটি ব্যক্তির সাথে কাজ করার জন্য তারা একজন বেতনভোগী DAIP নারীবাদী কর্মীকে নিযুক্ত করল। উদ্দেশ্য—অভিযোগকারী নারীকে মামলা দায়ের করতে প্ররোচিত করা। উপরন্তু, DAIP কর্মীরা তাদের নিজস্ব ধারাবাহিক তদন্ত চালিয়ে যেতে লাগল সমান তালে। পেন্সের ভাষায় তাদের লক্ষ্য ছিল—

> 'মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবীকে মামলা সম্পর্কিত তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ এবং মামলাসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচারককে সাহায্য করা (যেমন : অপরাধী আদালতে আসার জন্য লিখিত আদেশ জারি করা। সাজা প্রদানের সুপারিশ করা হবে কি না তা নির্ধারণের জন্য প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করা)।'

এখন এ বিষয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করা যাক। DAIP-এর পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কিত আইনজীবীরা বিচারকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তারা সিদ্ধান্ত নিত, কোনো মামলা বিচারের কাঠগড়া পর্যন্ত যাবে কি না। শুধু তা-ই নয়, অপরাধ তদন্তের সাথেও নিজেদের সম্পৃক্ত করত তারা। অথচ তারা পেশাদার কেউ না, কেবলই আর্টসে পড়ুয়া ফেমিনিস্ট। উপরন্তু পুরুষদের বিরুদ্ধে আরও বেশি দণ্ডাজ্ঞা নিশ্চিত করতে DAIP কর্মীরা অভিযোগকারীর পরিবর্তে ফোনকলে কথোপকথনকারী পুলিশ কর্মকর্তাকে অভিযোগের সাক্ষী হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পুলিশ কর্মকর্তাদের

অভিযোগকারী হিসেবে প্রতিস্থাপন করার এই বিষয়টি অনেক পুরুষকে অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত করে তুলেছিল।

পেন্সের ভাষায়—'অবশেষে ভিকটিমের লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ বাতিল করার পূর্বের চর্চাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে মামলা চলাকালীন ভিকটিমের সাথে আইনজীবী ও বিচারকের প্রাথমিক সাক্ষাৎকার কেবলই একটি সাক্ষ্য মাত্র (অর্থাৎ সে আর অভিযোগকারী বলে বিবেচিত নয়, শুধুই একজন সাক্ষী! ফলে চাইলেও আর সে মামলা প্রত্যাহার করতে পারবে না।'

DAIP-এর অনেক বিষয়ে সমস্যা রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা দরকার। মিথ্যা ধর্ষণ মামলার ক্ষেত্রে পুরুষদের যেমন ন্যায়বিচারের অধিকার রয়েছে, তেমনি পারিবারিক সহিংসতার অপরাধে অভিযুক্তদেরও সাধারণ আইন, আদালতের রুল এবং যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দ্বারা অনুমোদিত বেশ কিছু আইনি অধিকার রয়েছে। যেকোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিই তার অভিযোগকারীকে মোকাবিলা করার অধিকার রাখে। এ ছাড়া নিরপেক্ষ জুরি, ন্যায়বিচার এবং দোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ হিসেবে বিবেচিত হওয়া—এ সবই একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাথমিক অধিকার। যেহেতু এসব অধিকারের কোনোটিই নারীবাদী প্রতাপের কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হয় না, আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে এগুলো প্রাসঙ্গিক।

DAIP সকল অধিকার লঙ্ঘন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, অবৈধভাবে সাক্ষীর পরিবর্তন করা (অভিযোগকারীর পরিবর্তে ফোনকল নেওয়া পুলিশকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ) শুধু অনৈতিকই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে; বিশেষত ফেডারেল মামলার ক্ষেত্রে এটাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্ল্যাকের *আইন ডিকশনারিতে* অবৈধভাবে সাক্ষীর পরিবর্তনকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে—

> 'সাক্ষ্য দেওয়ার আগে ও পরে সাক্ষীকে হয়রানি, ভয় দেখানোর মাধ্যমে বিচারকার্যে বাধা প্রদান করা।'

DAIP কর্মীরা যখন পুলিশি তদন্তে জড়ানোর সময় ফৌজদারি মামলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সাক্ষীকে প্ররোচিত করে; অধিকন্তু যেহেতু তারা নিজেরাও ভিন্ন ভিন্ন তদন্ত চালায়, ফলে তাদের পক্ষে প্রমাণাদি বিকৃত করা কিংবা স্থায়ীভাবে তদন্তের ক্ষতিসাধন করাও খুবই সহজ। কোনোরূপ বৈধ প্রশিক্ষণ ছাড়াই DAIP কর্মীরা যখন প্রসিকিউটরকে সাজা প্রদান আর আইনি সিদ্ধান্ত নিতে

সহযোগিতা করতে যাবে, সেই অফিস কতটা আইনগত বিভ্রান্তির শিকার হবে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বহুদিন ধরে এটাই হয়ে আসছে। আর এ ব্যাপারে আইন সম্পর্কে অজ্ঞ ফেমিনিস্টদের কুচ পরোয়া নেই। ভাবখানা এমন—বৈধ প্রশিক্ষণ থাকলেও তারা এসব গোঁড়া, পুরুষবিদ্বেষী আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যেত। কারণ, DAIP সংস্থাটি অন্তর্গতভাবেই পুরুষ হন্তারক। পুরুষ হন্তারক বলতে মূলত কী বোঝায়?

অ্যাডাম লিপতাক ২০০৮ সালে *নিউইয়র্ক টাইমসে* ভার্জিনিয়ার একজন আইনজীবী লেসলি পি স্মিথকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, যিনি অন্য আইনজীবীদের অন্যায়ভাবে সাক্ষী পরিবর্তন এবং সাক্ষীকে নিয়ে কৌশল খাটাতে দেখেছিলেন। আরও দেখেছিলেন, এই বিষয়টি অভিযুক্তের আইনজীবীদের কাছ থেকে গোপন করা হয়েছিল খুব সূক্ষ্মভাবে। ফলে মূল টার্গেট ড্যারিল অ্যাটকিনসকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল আদালত। স্মিথ প্রকৃত সত্য প্রকাশের জন্য বারবার স্টেট বার অ্যাসোসিয়েশনের সাথে যোগাযোগ করলেও প্রতিবারই নীরব থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তাকে। সাথে যুক্ত হয়েছিল আইনজীবী পদ চলে যাওয়ার হুমকি। এরপর আশ্চর্যজনকভাবে ঘটনার মোড় ঘুরে যায়।

প্রায় ১০ বছর পর অ্যাসোসিয়েশন তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। স্মিথের সাক্ষ্যে সে যাত্রায় অ্যাটকিনস বেঁচে যায়। মনে রাখা দরকার, আইনজীবীদের অন্যায়ভাবে সাক্ষী পরিবর্তনের কারণেই বিচারক তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। স্মিথ যদি সেদিন ন্যায়বিচারের পক্ষে লড়াই চালিয়ে না যেতেন, ফৌজদারি আইনজীবীদের অন্যায়ভাবে সাক্ষী পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ পরিণামে একজন লোকের বিনা দোষে মৃত্যু হতো। এ ধরনের ঘটনা এটিই একমাত্র নয়; বরং অন্যায়ভাবে সাক্ষী বদল করা এখন নিয়মিত রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে *Christian Science Monitor* ফ্লোরিডার ক্রাইম ল্যাবে একটি সাক্ষী বদলের খবর পায়। তারা প্রতিবেদন করে—

> 'রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত একটি ক্রাইম ল্যাবের মাদক মামলায় একজন রসায়নবিদের বিরুদ্ধে সাক্ষী বদলের অভিযোগ বর্তমানে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। Pensacola Regional Crime Lab-এ কর্মরত সেই রসায়নবিদের বিরুদ্ধে অনুমোদিত ড্রাগ সরিয়ে প্যাকেটের ভেতর বিপুল পরিমাণ অননুমোদিত ড্রাগ রাখার অভিযোগ আনা হয়।

> সাক্ষী বদলের অভিযোগে প্রায় ২৬০০ ড্রাগ মামলায় শত শত মানুষকে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করা হতে পারে।'

ঠিক তার পরের মাসে, ২০১৪ সালের মার্চে আলাস্কার আঙ্কোরেজে *KTVA News* একটি প্রতিবেদন করে—

> 'স্টেট ক্রাইম ল্যাব-এর একজন প্রাক্তন কর্মীকে ছয়টি গুরুতর অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ৫৩ বছর বয়সি স্টিফেন পামারকে মাদক চুরি এবং অন্যায়ভাবে সাক্ষী বদলের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।'

পরিশেষে অ্যানি দুখানের বিষয়ে আলোচনা করা যাক। তিনি ক্রাইম ল্যাবেরই একজন রসায়নবিদ। *Pro Publica*-এর ২০১৭ সালের ১৯ মার্চের নিউজ স্টোরি অনুসারে—'তিনি বহুসংখ্যক মানুষকে জেলে পাঠানোর জন্য ড্রাগ পরীক্ষার ভুয়া ফলাফল তৈরি এবং অন্যায়ভাবে সাক্ষী-প্রমাণ বদলের কথা স্বীকার করেন। তার এই জালিয়াতির কারণে ২৪ হাজার মানুষ জেলে যেতে পারত।'

এটাই সত্যি। দুখান ল্যাবের সাক্ষী-প্রমাণ ধ্বংস করেছিলেন, যার কারণে অন্যায়ভাবে জেলে যেতে হতো প্রায় ২৪ হাজার মানুষকে। বিষয়টা নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন। একজন পুরুষবিদ্বেষী ফেমিনিস্ট সাক্ষী বদলের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য কতটা ক্ষতিসাধন করতে পারে!

বর্তমানে DAIP ডুলুথ মডেল হিসেবে বেশি পরিচিত। এই পুরুষ হন্তারক ফেমিনিস্ট কর্মকাণ্ড পুরো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের কিছু অংশে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। গোটা কার্যক্রমকে রূপান্তরিত করা হয়েছিল ২২টিরও অধিক ভাষায়। এ ছাড়াও এটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে কর্পোরেট ওয়েলফেয়ারের অন্যতম দীর্ঘমেয়াদি প্রজেক্ট। শুধু ফেডারেল সরকারই নয়, একে অর্থ, প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় আইনি পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিল বেশ কিছু অঙ্গরাজ্য।

এসব ব্যবস্থাপনার ফলে সরকারের অর্থায়নে এখন এটি একচেটিয়া প্রভাব অর্জন করতে সক্ষম হয়। সরকারি অনুদানের পাশাপাশি তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্লাস পরিচালনার মাধ্যমে অর্থ কামাত আর একযোগে আক্রমণ চালাত বিশ্বব্যাপী পুরুষদের ওপর। এটাই মূলত পুরুষ হন্তারক ফেমিনিস্টদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন। এই কথাগুলো কিছুটা গোঁড়ামিপূর্ণ

লাগছে হয়তো, কিন্তু পুরোটা জানার পর নিজেরাই বুঝতে পারবেন—আমার ধারণাগুলো কতটা যুক্তিসম্মত ও সমর্থনযোগ্য।

ডক্টর ডোনাল্ড ডাটন ১৯৭০ সালে টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সামাজিক মনোবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৪ সাল থেকেই তিনি পারিবারিক সহিংসতা গবেষণাকার্যের সাথে জড়িত; এমনকি এই বিষয়ে একটি সরকারি প্রতিবেদন তৈরির অভিজ্ঞতা ছিল তার।

তিনি ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত পারিবারিক সহিংসতার অপরাধীদের আদালত অনুমোদিত একজন থেরাপিস্ট ছিলেন। একটি মনস্তাত্ত্বিক প্যাটার্ন তৈরি করে পারিবারিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের চিকিৎসায় ডক্টর ডাটন এই অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করেন। তার রচিত বইয়ের সংখ্যা ১০টি, যার মধ্যে তিনটিই পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কিত। এর বাইরে তিনি ১২২টিরও বেশি পিয়ার রিভিউড প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কারণে তাকে পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সাক্ষী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়; এমনকি তিনি প্রখ্যাত আমেরিকান ফুটবলার ও অভিনেতা ও.জে. সিম্পসনের বিচারকার্যেরও সাক্ষী ছিলেন। ডাটন বর্তমানে ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্থায়ী অধ্যাপক। যদিও এটা সুস্পষ্ট, তবুও আরেকবার বলছি—আর্টস ডিগ্রিধারী এলেন পেন্সের চেয়ে ডক্টর ডাটন একটু বেশিই যোগ্য।

ডক্টর কেইন কর্ভো ১৯৯৩ সালে সমাজকল্যাণে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৭ সাল থেকে তিনি সিরাকাস ইউনিভার্সিটি অব সোশ্যাল ওয়ার্কের একজন অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত। এই পুরো সময়জুড়ে ডক্টর কেইন কর্ভো পারিবারিক সহিংসতা, গবেষণা প্রয়োগ পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি গবেষণা ও প্রোগ্রাম ইভ্যালুয়েশন প্রজেক্টের সাথে জড়িত ছিলেন তিনি।

এমনই একটি উদাহরণ হলো—FHL Foundation। এখানে তিনি পারিবারিক সহিংসতা, স্নায়ুবিজ্ঞান এবং সংযুক্তিমূলক তত্ত্ব সম্পর্কে লেখালিখি ও আলোচনা করেছিলেন। এর বাইরে তিনি সিরাকাসের মেয়রের কিশোর সহিংসতা সম্পর্কিত কমিশন, নর্ড কমিউনিটি মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ওহাইও ক্লেভিল্যান্ডের পারিবারিক সহিংসতা কার্যক্রমের আওতায় পারিবারিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তির চিকিৎসা কার্যক্রমের বিকাশ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করেছেন। ডক্টর কর্ভোর মেধা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতাও যে এলেন পেন্সের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি, সেটা উল্লেখ না করলেও চলে।

২০০৬ সালের মার্চে ডক্টর ডোনাল্ড ডাটন ও ডক্টর কেইন কর্ভোর যৌথ প্রচেষ্টায় একটি *পিয়ার রিভিউড* গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। 'Transforming a Flawed Policy : A Call to Review Psychology and Science in Domestic Violence Research and Practice' নামক সেই গবেষণাপত্র ছিল বিস্তর পরিসংখ্যানমূলক বিশ্লেষণে ঠাসা। তবে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হলো—গবেষণার ভূমিকাতেই তারা নারীবাদী মতাদর্শকে অস্বীকার করেছেন—

> '৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পারিবারিক সহিংসতা সমস্যায় জনগণের প্রতিক্রিয়া ছিল—এটি সামাজিকভাবে নারীর ওপর পুরুষ কর্তৃত্বের কুফল। অ্যাকটিভিস্টরাই এই ধারণা গড়ে তুলেছে। পারিবারিক সহিংসতার একমাত্র কারণ হিসেবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে দায়ী করার এই দৃষ্টিভঙ্গি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অন্যান্য দেশের প্রশাসনিক, আইনি ও নীতিগত আলোচনার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এটি প্রভাবিত করেছে গ্রেফতারে অগ্রাধিকার, বিচারকার্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং গ্রেফতারপরবর্তী কার্যক্রমসহ নানা আইনি নীতিমালাকেও। অথচ অনেক বিশিষ্ট গবেষক ভিন্ন ভিন্ন গবেষণায় দেখিয়েছেন—পারিবারিক সহিংসতার কারণ এক নয়, একাধিক।'

ডক্টর ডাটন ও ডক্টর কর্ভোর কথাগুলো সাংঘাতিক এবং এগুলো নারীবাদীদের পারিবারিক সহিংসতার পুরুষবিদ্বেষী তত্ত্বটিকে সম্পূর্ণভাবে খারিজ করে দেয়। আরও ভয়ানক ব্যাপার হলো—অনেকগুলো অঙ্গরাজ্য আইন করে পারিবারিক সহিংসতা বন্ধে চিকিৎসামূলক কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে।

এই সম্পর্কে তারা উভয়ে প্রতিবেদনে লেখেন—'বহু গবেষণায় নারী-পুরুষ উভয় লিঙ্গেরই মানসিক ঝুঁকি শনাক্ত হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক অঙ্গরাজ্য এবং কানাডার বিভিন্ন প্রদেশ এখনও সেকেলে এবং তথ্যবহির্ভূত নীতিই আঁকড়ে পড়ে আছে। তাদের নীতিতে মানসিক চিকিৎসা সম্পর্কিত যেকোনো চর্চা নিষিদ্ধ। এর পরিবর্তে তারা ডুলুথ মডেল নামে সংশোধিত নীতিকে আইন হিসেবে গ্রহণ করেছে।'

এই মডেলের প্রধান লক্ষ্য হলো—পুরুষদের দ্বারা 'মেল প্রিভিলেজের' অস্তিত্ব স্বীকার করিয়ে নেওয়া। এমনকি ডাটন ও কর্ভোও জানতেন, এটা একটা পুরুষ হন্তারক মতাদর্শ, যা পুরুষদের বিরুদ্ধে বৈষম্যই জারি রাখতে চায় কেবল। তাদের গবেষণা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে, পারিবারিক সহিংসতা হ্রাস বা

নির্দিষ্ট করতে ডুলুথ মডেল প্রায় সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর। গবেষকরা ১৯৯৯ সালে ডুলুথ মডেল পারিবারিক সহিংসতারোধে প্রভাব ফেলছে—এমন কোনো প্রমাণ বা পরিসংখ্যানগত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য খুঁজে পায়নি। যদিও এটি তাদের পর্যালোচনাকৃত অনেকগুলো গবেষণার মধ্যে একটি। পর্যালোচনা শেষে তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়—ডুলুথ মডেলের ফলাফল থেকে সুস্পষ্ট, এটি ফেমিনিস্টদের শেয়ানি কার্যক্রম বই আর কিছু নয়।

নারীবাদীদের জন্য এরচেয়েও খারাপ খবর দিয়েছেন ডক্টর ডাটন ও ডক্টর কর্ভোর গবেষণা। তারা দেখিয়েছেন, নারীদের বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতার প্ররোচক হিসেবে পুরুষতান্ত্রিক নিপীড়নের তত্ত্ব পুরোপুরি বানোয়াট। ডক্টর ডাটন ও কর্ভো বলেন—'সোজা কথায় বলতে গেলে, স্ত্রী নির্যাতনের কারণ হিসেবে পুরুষতন্ত্রের ধারণা অনুপযুক্ত এবং বহু গবেষণার বিপরীত। পুরুষদের চেয়ে নারীরাই নির্বিবাদ পুরুষদের বিরুদ্ধে বেশি সহিংসপ্রবণ আচরণ করে থাকে।'

ডুলুথ মডেলের ভিত্তি বস্তাপচা বিজ্ঞান এবং ত্রুটিপূর্ণ মতাদর্শের ওপর গঠিত বললেও কম বলা হবে। ডাটন ও কর্ভো পারিবারিক সহিংসতার কারণ হিসেবে পিতৃতন্ত্রকে শুধু অস্বীকারই করেননি; নারীরা পুরুষতন্ত্রের কারণে নিপীড়িত হয়, এই ধারণাকেও বাতিল করে দিয়েছেন। ফলে তাদের প্রতিবেদন নারীবাদীদের সরকারি রুটিরুজি তো বটেই, গোটা মতাদর্শকেই হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল। 'পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা নারীদের ওপর নিপীড়ন চালায়'—এমন মিথ্যাচারের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ পুরুষবিদ্বেষী নারীরা তাদের পুরো ক্যারিয়ার গড়েছিল। এই গবেষণা তাদের জন্য ছিল রীতিমতো স্বপ্নভঙ্গের মতো ব্যাপার।

অবশ্য নারীবাদীরা সেই ক্ষতি শিগগিরই কাটিয়ে উঠেছে বলা যায়। এখনও কলেজগুলোতে 'জেন্ডার স্টাডিজ' নামে পুরুষবিদ্বেষী বৈষম্যমূলক পুরো একটি কোর্স রয়েছে। এই ভুয়া মতাদর্শের ওপর কেউ চাইলে ডিগ্রিও অর্জন করতে পারে। তবে ডাটন ও কর্ভোর গবেষণাকার্য এখানেই থেমে থাকেনি, তারা তাদের অনুসন্ধান চালিয়ে গিয়েছেন। ২০০৯ সালে সিরাকাস বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিশাস্ত্র এবং আচরণের পিয়ার রিভিউড জার্নালে তারা 'পারিবারিক সহিংসতার অপরাধীদের ক্ষেত্রে ডুলুথ মডেলের হস্তক্ষেপ কি মানসিক স্বাস্থ্যের পেশাদার নৈতিকতার লঙ্ঘন করে?' নামক আরেকটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, এলেন পেন্স প্রথমবার এই ডুলুথ মডেল তৈরি করতে গিয়ে নীতিগতভাবে পুলিশের নিকট বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। অদ্ভুত ব্যাপার সেই পুলিশ সদস্যরা যথার্থই ছিলেন।

ডাটন ও কর্ভো উপসংহার টানেন—

> 'ডুলুথ মডেল পরিষ্কারভাবে মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক নীতির সাথে আগাগোড়া সাংঘর্ষিক।'

পুরুষদের বিরুদ্ধে ফেমিনিস্ট কর্মকাণ্ডের নিন্দা করার জন্য এর চেয়ে তীব্র ভর্ৎসনা আর কী হতে পারে! ডুলুথ মডেলকে তারা কেবল ত্রুটিপূর্ণ মতাদর্শের ভিত্তিতে গঠিত কাঠামো হিসেবেই দেখেননি; বরং একে অকার্যকর ও অনৈতিক প্রস্তাবনা হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গের বিরুদ্ধে সিস্টেম্যাটিক্যালি বৈষম্যমূলক আচরণ করার জন্য ডুলুথ মডেলের চেয়ে প্রতারণাপূর্ণ অসৎ পদ্ধতি আর কিছুই হতে পারে না।

২০০৯ সালে মন্টানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন স্কুলের জোনা রেজা 'Beyond Duluth : A Broad Spectrum of Treatment for Broad Spectrum of Domestic Violence' নামে একটি নিবন্ধ লেখেন। নিবন্ধটি মন্টানা আইন পর্যালোচনায় প্রকাশিত হয়েছিল। রেজার গবেষণায় লেখা হয়—'ডুলুথের মডেল মূলত তাদের ব্যক্তিগত কল্পনা। সামাজিক পিতৃতন্ত্রের জুজুর ভয় দেখিয়ে তারা মূলত পুরুষদের দমিয়ে রাখতে চায়। ডুলুথ মডেল পারিবারিক সহিংসতার অন্যান্য কারণ। যেমন : নিপীড়নমূলক সমস্যা, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, আক্রমণাত্মক প্রেক্ষাপট অথবা চলমান তিক্ত সম্পর্ককে চিহ্নিত করে না।'

তিনি আরও বলেন—'সহিংসতার পেছনে আরও ভয়ংকর কারণও থাকে। যেমন : সহিংসতাকারীর ওপর মানসিক চাপ, দম্পতির পরস্পর নেতিবাচক সম্পর্ক। কিন্তু এগুলোকে সহিংসতার কারণ থেকে কৌশলে বাদ দেওয়া হয়েছে। নারীরা কোনো সহিংসতামূলক কাজ করলে সেটা হয়ে যায় অস্তিত্বহীন, আত্মরক্ষামূলক কিংবা অগ্রাহ্য করার মতো তুচ্ছ ব্যাপার।'

রেজার পুরো গবেষণাপত্রটি ডুলুথ মডেলের সমালোচনা করার পাশাপাশি ডাটন ও কর্ভোর গবেষণাকেও সমর্থন করে এবং অবিলম্বে ডুলুথ মডেল বন্ধের আহ্বান জানায়। যদিও আরও অনেক বিশেষজ্ঞ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিত্বরা এসব গবেষণাগুলোকে সমর্থন করেছেন, কিন্তু তাদের অনেকেই ডুলুথ মডেলের সবচেয়ে প্রতারণাপূর্ণ দিকটা ধরতে পারেননি। আর সেটা হলো—The Family Law Domestic Violence Restraining Order।

ডুলুথ মডেল নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে গিয়ে নিজেই একটি সহিংস প্রতিরোধ পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছিল। আরও ভয়ংকর ব্যাপার ছিল বিচারকার্যে *DAIP*

প্রতিনিধিদের উপস্থিতি। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের বিচারকদের সাথে অপরাধের কোনো চুক্তি না থাকলেও DAIP কর্মীরা বিবাদীর শাস্তির জন্য সুপারিশ করতে পারেন। তাদের মতে, এই ধরনের পদক্ষেপ অপরাধমূলক তো নয়ই; বরং প্রকৃতিগতভাবে আইনসম্মত। যেমন : গাড়ি দুর্ঘটনায় দুজন ব্যক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বাদীকে বলা হবে পিটিশনার, বিবাদীকে বলা হবে রেসপন্ডেন্ট। নাম যা-ই হোক, দুই পক্ষের জন্যই এটি একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়।

পেন্স স্বীকার করেন, নারীবাদীরা এই ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। এমনকি DAIP-এর প্রতিরোধ আদেশ লঙ্ঘন করলে তারা 'ম্যাজিস্ট্রেট' বিচারকের কাছে শাস্তির সুপারিশও করতে পারে। এই ত্রুটিপূর্ণ কাজটি বিচারকদের নৈতিকতা ও বিচারসংক্রান্ত নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কেননা, মামলার রায় নিয়ে আদালতের বাইরে বিচারকদের কারও সাথে যোগাযোগ করার এখতিয়ার নেই। এই ব্যবস্থা লঙ্ঘনের কারণে অতীতে অনেক বিচারপতিকে তাদের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তথাপি পেন্সের মতে, এই নিষেধাজ্ঞা নারীর পুরুষদের বিরুদ্ধে তাদের সক্রিয়তার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

তবে এক্ষেত্রেও খারাপ সংবাদ রয়েছে। নারীবাদীরা চাইলেই পারিবারিক সহিংসতা নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রক্রিয়া অনুযায়ী পুরুষদের সাংবিধানিক এবং বৈধ অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারবে। একজন পুরুষের বিরুদ্ধে দেওয়ানি আদালতে পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগ দায়ের করা হলে, তাকে সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। কারণ, এটি দেওয়ানি আদালতের একটি কার্যক্রম।

তখন সে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী অনুযায়ী নীরব থাকার অধিকারটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কারণ, সে যদি নিজের নির্দোষিতার প্রমাণ নিয়ে প্রকৃত ঘটনার সপক্ষে যুক্তি না পেশ করে, তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাকে দোষী বলে গণ্য করে নেওয়া হবে। আবার যেহেতু তিনি দেওয়ানি আদালতে অপরাধ সংঘটনের কারণে অভিযুক্ত, ফলে আইনজীবী নিয়োগের সামর্থ্য না থাকলে আদালত তার জন্য নিজ দায়িত্বে কোনো আইনজীবী নিয়োগ করবে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—আদালতের রায় খুবই দ্রুত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। ফলে আইনজীবী থাকলেও অন্যান্য ফৌজদারি বিচারকার্যের মতো তার আইনজীবী স্বতন্ত্রভাবে অভিযোগ তদন্ত করার সময় পায় না। ন্যায্য বিচারকার্যের এই লঙ্ঘন একটি ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে। বেশির ভাগ

ক্ষেত্রেই পুরুষদের জন্য এসব মামলায় জয় লাভ করা প্রায় অসম্ভব। কারণ, পুরো প্রক্রিয়াটি ইচ্ছাকৃতভাবে পুরুষদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের জন্য তৈরি।

পশ্চিমা বিশ্বে প্রায় সমস্ত পারিবারিক আইনের বিচারক এবং বিচারিক কর্মীরা ফেমিনিস্ট। পুরুষবিদ্বেষী মতাদর্শী হিসেবে তারা একজন পুরুষকে কখনোই ন্যায়বিচার দেয় না। ফলে মহল্লার একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির জন্য বিচারের আশায় সাদা আধিপত্যবাদী গ্রুপ Ku Klux Klan-এর কাছে যাওয়া যে কথা, পারিবারিক সহিংসতার অপরাধে অভিযুক্ত একজন পুরুষের জন্য কোনো ফেমিনিস্ট বিচারকের কাছে যাওয়াটা ঠিক একই রকম। পল্লি অঞ্চলে প্রায় সকল বিচারক, জুরিবর্গ এবং আদালতের কর্মচারী এই বর্ণবাদী সংগঠনের সদস্য। বর্তমানকালের পারিবারিক সহিংসতা নিয়ন্ত্রণাদেশসমূহ একজন পুরুষকে তার বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে, তার সম্পদ লুট করতে এবং সন্তানদের দেখাশোনা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর প্রকাশ্য লাঞ্ছনা তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ফলে বিপুল পরিমাণ পুরুষ চাকরি, বন্ধুত্ব ও জনসমাজের সমর্থন হারিয়ে ফেলছে।

এভাবে নিগৃহীত হওয়া একজন লোক যদি আত্মহত্যা করে, সেটা কি খুব বিস্ময়কর ব্যাপার হবে? ফেমিনিস্টদের দ্বারা অন্যায়ভাবে নিপীড়নের শিকার ব্যক্তিদের সবাই আত্মহত্যা না করলেও কখনোই তারা মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করতে পারে না; গোটা জীবন বরবাদ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিই একজন মানুষ চূড়ান্ত নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে পড়ে। তবুও নারীবাদীরা আমাদের কাছে দাবি করে—তাদের মতাদর্শ নাকি লিঙ্গসমতামূলক!

নারীর বিশেষ সুবিধা

শুরু থেকেই নারীবাদীরা প্রতিনিয়ত এবং জোরালোভাবে দাবি করে আসছে, পুরুষতন্ত্র তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক। এই দাবি থেকে আপনারা মনে করতে পারেন, পুরুষরা নারীদের ভৃত্য বা দাসী হিসেবে গণ্য করে। তবে একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, এটা তাদের আরেকটি মিথ্যাচার। বস্তুত নারীরা সমাজে এমন অনেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুবিধা পেয়ে থাকে, যেগুলো লিঙ্গসমতার বিতর্কে কখনো উল্লেখ করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ যেমন : বাস, ট্রেন বা অন্যান্য জনবহুল জায়গায় একজন পুরুষ নারীকে বসার সিট ছেড়ে দেয়, যাতে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়।

কিন্তু এর বিপরীতটা কখনো ঘটে কি? একজন নারী যদি সিটে বসে থাকে, একজন পুরুষকে তার সিট ছেড়ে দিতে হয় না। কিন্তু এই একই কাজ যদি একজন পুরুষ করে, সমাজের কাছে সে চিহ্নিত হবে নিষ্ঠুর ও অবিবেচক বলে। ২০১৬ সালের ২৬ মার্চ অ্যানি পোস্ট তার Where Are the Stand Up Men নামক নিবন্ধে ঠিক সে রকমই একটি একপেশে মন্তব্য তুলে ধরেন। নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল *Odyssey Online* থেকে। তিনি তার প্রথম অনুচ্ছেদটিই পুরুষদের লাঞ্ছিত করার মধ্য দিয়ে শুরু করেন। তার অবস্থান—

> 'পুরুষদের কাছে যানবাহনে তাদের জায়গা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিতম্ব নারীদের অনিবার্য প্রয়োজনীতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

এই বক্তব্য কতটা নারীকেন্দ্রিক এবং পুরুষবিদ্বেষী, সেটা বোঝার মতো জ্ঞান অ্যানির নেই। এমনকি সে এটাও অনুধাবন করতে পারেনি যে, পুরুষরা নারীর সমকক্ষ হলে নারীদের মতো তাদেরও স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করা উচিত নয়। অ্যানির মতো আত্মমগ্ন ফেমিনিস্টদের প্রতি আমার পরামর্শ—সিট পেতে চান?

আগেভাগেই চলে আসুন। যেহেতু আপনারা সমান অধিকার লাভ করেছেন, এখন সমান দায়িত্ববোধও আপনাদের ওপর ন্যস্ত। নারীদের জন্য বিচ্ছিন্ন পাবলিক প্লেসের দরজা খুলে রাখার ক্ষেত্রেও একই ভণ্ডামি পরিলক্ষিত হয়।

সামাজিকভাবে পুরুষের জন্য দরজা খুলে রাখা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো নারী যদি কোনো পুরুষের জন্য দরজা খুলে ধরে রাখে, সমাজ ধরে নেয়—সেই পুরুষের প্রতি তার প্রেম রয়েছে। আর একজন পুরুষ অপর পুরুষের জন্য এই কাজ করলে সব সময় সজাগ থাকতে হয়, যেন কেউ এই উদারতাকে সমলিঙ্গের প্রেম ভেবে না বসে। প্রকারান্তরে যখন নারীরা প্লেন, ট্রেন, নৌকা বা মোটরগাড়িতে ভ্রমণ করেন, দুর্ঘটনায় স্থানান্তর এবং উদ্ধারের ক্ষেত্রে তাদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তো সেটা আরও জঘন্য। নারীরা শুধু তাদের পুরুষ সঙ্গীর কাছে বিল দেওয়া প্রত্যাশাই করে না, ক্ষেত্রবিশেষে দাবিও করে বসে।

উদাহরণস্বরূপ জর্ডান গ্রের কথা বলা যাক। জর্ডান একজন 'পুরুষ-ফেমিনিস্ট সম্পর্ক প্রশিক্ষক' (তার পরিচয়ের মধ্যেই তামাশা রয়েছে)। পুরুষদেরকে নারীদের সাথে কোমল আচরণ এবং নারীদের স্বার্থে ব্রত হওয়ার শিক্ষা দেওয়াই তার কাজ। ২০১৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর Good Men Project-এর জন্য জর্ডান 'যে তিনটি কারণে প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে পুরুষদের সব সময় বিল পরিশোধ করা উচিত' নামক একটি কলাম লেখে। জানিয়ে রাখি—The Good Cuck প্রকল্পটি নারীবাদীদের দ্বারা চালিত। নারীবাদী অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে পুরুষদের 'উপকারী বলদ' হিসেবে গড়ে তোলাই এই প্রজেক্টের লক্ষ্য। জর্ডানের বর্ণিত তিনটি কারণ নিম্নরূপ—

১. 'নারীদের মেকাপসামগ্রী এবং অন্তর্বাস কিনতে হয়।' অর্থাৎ, নারীদের এসব অতিরিক্ত খরচের ফলে খাওয়াদাওয়ার বিল সব সময় পুরুষের দেওয়া উচিত!

২. 'নারীর তুলনায় পুরুষের বেতন ও উপার্জন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি।' বেতনের তারতম্যসংক্রান্ত এই মিথ্যাচার আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি।

৩. একজন লোক তার নারী সঙ্গিনীর বিল পরিশোধ করলে, সেই নারী তার সাথে আরও বেশি প্রণয়পূর্ণ সময় কাটাবে।' এই বায়বীয় যুক্তি শুনে জর্ডানের কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তোলাই স্বাভাবিক। সেই আশঙ্কায় আগেভাগেই তাদের মুখ বন্ধের ব্যবস্থা করা হয়েছে—

> 'যদি আপনি বিল পরিশোধ করতে না পারেন, তাহলে আপনার সেই ডেটে যাওয়াই উচিত হয়নি।'

দুর্ভাগ্যবশত তার মতো পুরুষবিদ্বেষী এবং নারীলোভী অসৎলোকেরাই আজকের দিনে এসে এ রকম জঘন্য উপদেশ দিতে পারে। আরও পরিচ্ছন্নভাবে বোঝার জন্য বিষয়টাকে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করা যাক। একজন নারীর বিল পরিশোধের মাধ্যমে আপনি মূলত তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, সে আপনার সমকক্ষ নয়। আপনি মূলত তাকে নিজের সমান যোগ্যতা ও মর্যাদাসম্পন্ন মনের করেন না। যদি সে আপনার সমকক্ষই হয়, তাহলে সে সমানভাবে বিল পরিশোধ করার ব্যক্তিত্ব ধারণ করে। বিল পরিশোধ করার মাধ্যমে আপনি কেবল এটাই স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, আপনি অতীতের একজন অসভ্য নারীবিদ্বেষী।

অনারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও তার এই উপদেশ অগ্রহণযোগ্য। যেসব নারীরা পুরুষদের নিকট থেকে বিল পরিশোধ প্রত্যাশা করে, তারা প্রায়ই কেবল বিনামূল্যে খাওয়ার জন্য পুরুষদের ব্যবহার করে থাকে মাত্র। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে পুরুষদের ওপর এই নারীদের কোনো আত্মিক অনুভূতি থাকে না। নিঃসন্দেহে এটা একধরনের প্রতারণা। ব্রিটনি পিয়েরের কথাই ধরা যাক। এ রকম বহু প্রতারকের মধ্যে সে একজন। ২০১৬ সালের ২৫ মার্চ শ্যান্টেল ই জেমিসন লেখেন—'For Shame : Woman Fesses Up to Using Dates for Free Food'। শ্যান্টেল ব্রিটনির স্বীকারোক্তি জানিয়ে রিপোর্ট করেছিলেন—

> 'আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আসলেই কাদের সাথে ডেটে যেতে চাই। এর কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। আমি শুধু আগ্রহ নিয়ে যেতাম আর দেখতাম, কারা কারা আমাকে ডেটে নিয়ে যেতে আগ্রহী।'

কার্যত ব্রিটনি পুরুষদের ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এতটাই আত্মপ্রসাদপূর্ণ ছিল যে, XOJane-তে 'It Happended to Me : I Cruised OkCupid And Craigslist for Dates So I Could Eat' নামে সে নিজেই একটি কলাম লেখে। সেখানে সে স্বীকার করে—২০১১ সালে স্নাতক শেষ করার পর থেকেই সে টাকার জন্য পুরুষদের ব্যবহার করতে শুরু করে।

তার ভাষায়—'আমি OkCupid ও Craigslist ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিই, যেন সপ্তাহে তিনবারও নিজের মানিব্যাগে হাত না দিতে হয়। এজন্য সবার আগে নিজের ব্যাপারে সঠিক তথ্য দিয়ে একটি প্রোফাইল তৈরি করেছিলাম। বলেছিলাম—"আমি একজন লেখিকা; কোন ধরনের সিনেমা আমার পছন্দ, নাচ ও টুইটারের ব্যাপারে আমি কতটা মোহাবিষ্ট এবং কোন ধরনের পুরুষের প্রতি আমি আগ্রহী।'

প্রতিদিনই বেশ লোভনীয় পুরুষদের থেকে ম্যাসেজ পেতাম।

শিকারকে বাগে আনার জন্য প্রত্যেকের সাথেই গল্পগুজব জুড়ে দিতাম। তারপর আশায় থাকতাম, তারা আমাকে ডেটিংয়ের প্রস্তাব দেবে। ১০ বারের মধ্যে নয়বারই সেটা হতো। আমি শহরের মধ্যে এমন একটি রেস্টুরেন্ট বাছাই করতাম, যেখানকার খাবার আমার সবচেয়ে প্রিয়।'

একজন পুরুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার ব্যক্তিগত ও পেশাদারি কৃতিত্বের মাধ্যমে। পক্ষান্তরে বহু নারীর মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার ব্যক্তিগত ও পেশাদারি অর্জন দিয়ে নয়; বরং নেহায়েত নারী হওয়ার বরাতে! আমি নারীদের ঘৃণা করি না। কিন্তু খেয়াল করেছি, তাদের এই মনোভাবের সাথে পরজীবীর চমকপ্রদ মিল পাওয়া যায়। বেঁচে থাকার জন্য এরা উভয়েই কাউকে না কাউকে ব্যবহার করে। এ ধরনের নারীদের উদাহরণ ভূরিভূরি। তবে উৎকৃষ্টতর উদাহরণ হচ্ছে রবিন ডেনিজ মুর। পেশাসূত্রে রবিন ছিল অস্ট্রেলিয়ার একজন দন্ত সেবিকা। একসময় সে অভিনেতা ও চলচিত্র নির্মাতা মেল গিবসনকে বিয়ে করে। গিবসনের সাথে যৌন সম্পর্ক করা ছাড়া রবিন তার জীবনে আর কোনো কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেনি।

৩০ বছর বৈবাহিক সম্পর্কে থাকার পর রবিন যখন বিচ্ছেদের পথ বেছে নেয়, সঙ্গে নিয়ে যায় গিবসনের বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি। শুনতে আশ্চর্য শোনালেও তার মোট অ্যালিমনির পরিমাণ ছিল ৪০০ মিলিয়ন ডলার। তবে ৩০ বছরের সম্পর্কে গিবসন তাকে যা যা দিয়েছিল এবং যেসব বিল পরিশোধ করেছিল, তার কোনোটাই এর অন্তর্ভুক্ত নয়। সেগুলো যোগ করলে এই বিয়েকে কেন্দ্র করে মুরের আয় ৪০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি হবে।

আরেকজন স্বাধীনচেতা ক্ষমতাবান নারী হলো অ্যানা টর্ভ। তবে অ্যানা মারডক মান নামেই সে বেশি পরিচিত। সে ছিল বিখ্যাত ধনকুবের রুপার্ট মারডকের প্রাক্তন স্ত্রী। মারডক একজন মিডিয়া পুঁজিপতি, যার সম্পত্তির পরিমাণ ১৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। তিনি ৩০ বছর ধরে *News Corp*-এর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং বর্তমানে কার্যনির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়াও তিনি 21st Century Fox-এর চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে তিনি কোম্পানিটির সহকারী চেয়ারম্যান এবং *Fox News*-এর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী হিসেবে কর্মরত। বিয়ের পর অ্যানাকে নিউজ কর্পোরেশন বোর্ডের দায়িত্ব দেন রুপার্ট। যদিও সে তিনটি বই রচনা করেছে, *ডেইলি টেলিগ্রাফ*-এর সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে, কিন্তু তার কোনো কাজই খুব একটা উল্লেখযোগ্য ছিল না। তার প্রধান কৃতিত্ব ছিল বিবাহবিচ্ছেদের

মারডক রুপার্টের ১.৭ বিলিয়ন ডলার খেসারত দেওয়া এবং ছয় মাস পরে অন্য আরেকজনের ঘরে ওঠা।

এরপর আমরা হুয়ানিতা ভ্যানয়ের কথা বলব। আপনারা সম্ভবত তাকে মাইকেল জর্ডানের প্রাক্তন স্ত্রী হিসেবেই ভালো চেনেন। জর্ডান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পেশাদার বাস্কেটবল খেলোয়াড় হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত। ২০১৭ সালে তিনি ১.৩ বিলিয়ন ডলার সম্পত্তির মালিক হন। জর্ডানের সবচেয়ে বড়ো পৃষ্ঠপোষক নাইকি তার ব্র্যান্ডেড জুতা থেকে বাৎসরিক আয় করত প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার। এ ছাড়াও জর্ডান Upper Deck, Hanes, Gatorade সংস্থা থেকেও অর্থ উপার্জন করে। তাহলে হুয়ানিতার অর্জন কী ছিল? পেশাসূত্রে ব্যর্থ এই প্রাক্তন মডেল তার গর্ভে জর্ডানের সন্তান ধারণ করেছিল। সেটা জানার পরই জর্ডান তাকে বিয়ে করে। কিন্তু হুয়ানিতা সেই বিয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় নিজের সাথে করে নিয়ে যায় ১৬৮ মিলিয়ন ডলার। সেই সময়ের হিসাবে এটাই সবচেয়ে বড়ো সেলিব্রিটি বিবাহবিচ্ছেদের অ্যালিমনি।

এরপর আমরা ফিমেল প্রিভিলেজের পরবর্তী ধাপ 'পিতা-মাতার অধিকার' নিয়ে কথা বলব। এই বিষয়টিতে নানাদিক দিয়েই নারীদের বিশেষাধিকার প্রদান করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন নারী আইনসম্মতভাবে তার সন্তানের গর্ভপাত, দত্তক, পরিত্যাগ কিংবা নিজের কাছে রাখার ইচ্ছা করতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে এসব সিদ্ধান্তে পিতার কোনো কিছু বলার অধিকারই নেই। নিরাপদ আশ্রয় আইনের কারণে মা যদি সন্তানের পিতার নিকট থেকে তার গর্ভাবস্থা লুকান, তাহলে তিনি সন্তানকে পরিত্যাগ করে হাসপাতাল বা ফায়ার স্টেশনে ফেলে রাখতে পারবেন। আইনত সেই অধিকার তার আছে। কিন্তু একজন পিতার এ রকম কোনো অধিকার নেই। সন্তানকে দত্তক দেওয়া উচিত কি না—তা নির্ধারণ করার অধিকারও এই একচোখা আইন তাকে দেয় না।

প্রকৃতপক্ষে যদি একজন পিতা তাঁর সন্তানকে পরিত্যাগ করতে চায়, তাকে দুষ্ট বাবা হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তার মাতাকে ভূষিত করা হবে 'সাহসী মা' উপাধিতে। এই প্রসঙ্গ এলেই বেশির ভাগ নারীবাদীরা প্রতিক্রিয়া জানায়—

> 'যেহেতু তারা উভয়েই যৌন সম্পর্কে জড়িয়েছিল, সুতরাং পিতাকেই দায়িত্ব নিতে হবে।'

নারীবাদীদের এই প্রতিক্রিয়ায় তাদের আত্মজ্ঞানের অভাব লক্ষ করা যায়। তাদের বক্তব্যটি আরেকবার পড়ুন—'তারা উভয়েই যৌন সম্পর্কে জড়িয়েছিল।' অথচ

দায়িত্বের সবটুকু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে পিতার ওপর। নারীবাদীরা কখনোই দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার কথা বলে না। নেতিবাচক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তারা পুরুষদেরই কেবল নারীদের সিদ্ধান্তের ভুক্তভোগী হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এর সবচেয়ে শক্তিশালী উদাহরণ হলো পশ্চিমা বিশ্বে পিতৃত্ব জালিয়াতি।

রোনাল্ড কে হেনরি ২০০৬ সালের বসন্ত সংখ্যায় *পিয়ার রিভিউড* পারিবারিক আইনসংক্রান্ত একটি ত্রৈমাসিকে 'The Innocent Third Party, Victims of Paternity Fraud' শিরোনামে একটি কলাম লেখেন। সেখানে তিনি বলেন—'অসৎ স্বামী, ধনী বা বিখ্যাত পুরুষের জন্য পিতৃত্ব জালিয়াতি সব সময়ই ঝুঁকিপূর্ণ। পিতৃত্ব জালিয়াতির একটি বিখ্যাত মামলা হয়েছিল। সেই মামলায় ধনকুবের কির্ক কেরকোরিয়ানের প্রাক্তন স্ত্রী স্বীকার করে যে, সে তার চার বছরের কন্যাশিশুকে লালন-পালনের জন্য প্রাক্তন স্বামীর কাছে ৩,২০,০০০ ডলার দাবি করেছিল। অথচ কেরকোরিয়ান মূলত ওই সন্তানের জনকই নয়। মহিলাটি এক্ষেত্রে ডিএনএ টেস্ট জালিয়াতি করেছিল মাত্র।'

ধনীরা এভাবে প্রায়শই পিতৃত্ব জালিয়াতির শিকার হতে পারেন। বিশেষত ক্রমবর্ধমান বিবাহবহির্ভূত সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে। হেনরি আরও জানান—'অগণিত পুরুষ যারা ধনী বা বিখ্যাত কোনোটাই নন, তারাও পিতৃত্ব জালিয়াতির ঝুঁকিতে রয়েছেন।'

পিতৃত্ব জালিয়াতি কী পরিমাণে বিস্তৃত? আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব ব্লাড ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, ক্যালিফোর্নিয়ায় সংঘটিত প্রায় ২৮% পরীক্ষায় পিতা হিসেবে নথিভুক্ত ব্যক্তিদের জৈবিক পিতার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। শুধু ক্যালিফোর্নিয়াতেই পিতৃত্ব জালিয়াতির হার প্রায় ৩ থেকে ১০ শতাংশ। তবে এই সংখ্যায় পিতা অজ্ঞাত বা পিতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে—এমন ঘটনাগুলো অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা নিশ্চিত করেছে ফ্লোরিডার একটি থার্ড পার্টি কোম্পানি প্রিমিয়ার স্ক্রিনিংস। তাদের প্রশাসনিক ও ল্যাবরেটরি সুবিধা যেমন আছে, একই সঙ্গে রয়েছে ডিএনএ পরীক্ষা, ল্যাব পরীক্ষা, ড্রাগ ও ব্যাকগ্রাউন্ড চেক এবং ডট কমপ্লায়েন্স সার্ভিসের ব্যবস্থা। পুরো যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও সিএলআইএ কর্তৃক স্বীকৃত পরীক্ষাগারগুলোর সাথে তারা কাজ করে। তাদের ক্লায়েন্টদের মধ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং অঙ্গরাজ্যগুলো অন্তর্ভুক্ত। কোম্পানিটির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে—

'পিতৃত্ব প্রমাণের জন্য প্রতিবছর প্রায় তিন লক্ষ ডিএনএ পরীক্ষা করা হয় এবং এই পরীক্ষাগুলোর মধ্যে ৩০% ক্ষেত্রে দেখা যায় পুরুষটি সন্তানের জৈবিক পিতা নয়।'

আপনাদের কাছে এখন নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট যে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০ জনে তিনজন অবিবাহিত বাবাকে অন্যের সন্তানের মাধ্যমে প্রতারণামূলকভাবে ফাঁসানো হয়। তবে সত্যি বলতে এই সংখ্যাটা আরও বেশিও হতে পারত। এখানে শুধু সেসব পিতার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যারা তাদের পিতৃত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। বাকিরা তো সঙ্গীর দাবির প্রতি আস্থা রেখে নিজের পিতৃত্ব প্রমাণ করতে উদ্যোগই নেয়নি। আপনি যদি যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা হয়ে থাকেন, এই সংখ্যা সেখানে আরও বেশি। ম্যানচেস্টার ইভিনিং নিউজে লুসি ক্রয়ের ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারির এক প্রতিবেদন অনুসারে—'পিতৃত্ব পরীক্ষা দেওয়া প্রায় অর্ধেক পুরুষই সন্তানের প্রকৃত বাবা নন।'

প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে—'স্যালফোর্ডভিত্তিক বায়োক্লিনিক্স গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান টেস্টিং ফার্ম ডিএনএ ক্লিনিকস জানুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০১৬ সালের মধ্যে বাছবিছারহীনভাবে সংগৃহীত পাঁচ হাজার ফলাফল বিশ্লেষণ করে। ফলাফল থেকে জানা যায়, যুক্তরাজ্যের পরীক্ষিত ৪৮ শতাংশ বা ২৩৯৬ জন পুরুষ আসল জৈবিক পিতা ছিলেন না। সামগ্রিকভাবে ইংল্যান্ডে ৫১ শতাংশ পুরুষ আসল জৈবিক পিতা নন। উত্তর আয়ারল্যান্ডে এই সংখ্যাটা ৪২ শতাংশ এবং স্কটল্যান্ডে ৩৯ শতাংশ।'

— এই সংখ্যা কিছুটা বেশি। কিন্তু পিতৃত্ব জালিয়াতিকারী নারীদের বিষয়ে নারীবাদী সংগঠন এবং সেগুলোর নেতাদের অবস্থান কী? বাহ্যত তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে কেউই নেই। পালটা যুক্তি খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়ে নারীবাদীরা এ ব্যাপারে পিনপতন নীরবতা অবলম্বন করছেন।

এরচেয়েও ভীতিপ্রদ ব্যাপার হলো—কিছু নারী পুরুষের শুক্রাণু চুরি করে প্রতারণাপূর্ণভাবে গর্ভধারণ করে এবং পুরুষটিকে সন্তানের বাবা বলে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে। এটাকে বলা হয় শুক্রাণু চুরি বা Sperm Jacking। *আরবান ডিকশনারি*-এর সংজ্ঞানুযায়ী স্পার্ম জ্যাকিং হলো—

'সাধারণত পুরুষের অনিচ্ছায় তার সন্তান গর্ভধারণের জন্য নারীদের দ্বারা তার শুক্রাণু সংগ্রহকরণ।'

এই কাজ কীভাবে করা হয়? Feminista 8M তাদের পাঁচ বছরের পুরোনো একটি রেডডিট পোস্টারে স্পার্ম জ্যাকিংয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করেছে। এখানে সেটি পুনর্মুদ্রণ করা হলো—

'প্রথমেই প্রভাবশালী কাউকে খুঁজে বের করুন। পানশালা, ক্লাব বা কনসার্টে যান। সেসব জায়গায় যান—যেখানে আপনি খোশগল্প করতে পারবেন, মদ পান করতে পারবেন, আবার শারীরিক হয়রানি থেকেও পার পেয়ে যাবেন। এরপর এমন একজন পুরুষকে খুঁজে নিন, যিনি একপাশে একাকী দাঁড়িয়ে গানের সাথে সাথে দুলছেন। তাকে আপনার সঙ্গে নাচের প্রস্তাব করুন। যদি সে না বলে, ঘাবড়াবেন না। দ্বিতীয় ধাপ তখনও বাকি। এবারে কিছুক্ষণ ধরে নাচতে থাকুন এবং সে মজা পাওয়ার আগেই থেমে যান। প্রয়োজনে মদ কিনে দিন, স্বাভাবিক কথাবার্তা বলুন। অবশ্যই কোনো ভারিক্কি কথা বলবেন না; বরং আলাপ করুন হালকা চালে। হতে পারে সেটা তার চাকরি-বাকরি, পছন্দের টিভি সিরিয়াল কিংবা বন্ধুবান্ধব নিয়ে। পারলে দেখুন আরেকটি আস্ত বোতল গেলানো যায় কি না। চিন্তা করবেন না, আপনি তাকে মাতাল ও শিথিল করছেন মাত্র। তা ছাড়া পুরুষদের একটু শিথিলতা দরকার। জানেনই তো, সমাজ তাদের ওপর অনেকটাই অনমনীয়!

তাকে সিনেমায় যাওয়ার প্রস্তাব দিন। যদি সে না-সূচক উত্তর দেয়, আপনার কাজ হতাশ হওয়া নয়; বরং তাকে আরেক পেগ অফার করা। এভাবে বারংবার চেষ্টা চালান। মনে রাখবেন, তার "না" মানে হলো "এখনও না"। সুতরাং জেমস বন্ড বা টারান্টিনোর সিনেমা সম্পর্কে বলতে থাকুন। এ পুরুষরা সাধারণত টারান্টিনো খুব পছন্দ করে। একসময় তাকে আপনার বাসায় যাওয়ার প্রস্তাব দিন। যদি তার উত্তর নেতিবাচক হয়, তাহলে? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। আরও খানিক মদ খাওয়ান এবং খাওয়াতেই থাকুন, যতক্ষণ না সে উন্মোত্ততায় হ্যাঁ বলে দেয়।

আপনার বাসায় ফেরার পথে তার উচ্চতা, মাথার খুলি, হাড়ের ঘনত্ব আর হৃদয়ের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করুন। তার, শুক্রাণু গুরুত্বপূর্ণ কি না, সেটা সংগ্রহ করার আগেই আপনাকে বুঝতে হবে। আর তারপরই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, হে রমণীগণ। বিদায় দেওয়ার পূর্বেই তার গাড়ির লাইসেন্স, ক্রেডিট কার্ড এবং ফোন রেকর্ডের কপি নিজের কাছে রেখে দিতে ভুলবেন না। যদি পরদিন সে আপনাকে

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে, সে না থামা পর্যন্ত তাকে অপমান করুন। যদি আপনি তার শুক্রাণু সন্তান তোষণের নামে অর্থ আয়ের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চান, এরপর আপনার আর একটাই কাজ বাকি। শুধু পুলিশি শুনানির সময় তার বিরুদ্ধে একটা ধর্ষণের মিথ্যা মামলা ঠুকে দিন। অতএব শুভকামনা হে রমণীগণ!'

আপনারা ভাবতে পারেন এমন ঘটনা বিরল, সেক্ষেত্রে আপনার ধারণা ভুল। একটি জরিপে দেখা যায়, জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নারীরা কমপক্ষে ৪২% সময়ই মিথ্যা কথা বলে। ২০১১ সালের ৩ নভেম্বর মিস জোনস তার শুক্রাণু চুরির স্বীকারোক্তি দিয়ে ডেইলি মেইলে The Craving For A Baby That Drives Women to the Ultimate Deception শিরোনামে একটি কলাম লেখেন। সেখানে সে স্বীকার করে—

'আমি একটি পরিকল্পনা করেছিলাম; অন্যদের কাছে সেটা নিষ্ঠুর ও অপরিচ্ছন্ন মনে হতে পারে। যেহেতু আমি তার কাছে যা চেয়েছিলাম, সে দেয়নি; তাই চুরি ভিন্ন আমার কোনো পথ ছিল না। মাসখানেক আমি তার শুক্রাণু চুরির পরিকল্পনা করি। আমার মনে হয়েছিল—যেহেতু সে আমার সাথে বসবাস করছে, কাজেই এটা আমার অধিকার। একরাতে সহবাসের পর তার ব্যবহৃত কনডমটি সাথে নিয়ে আমি বাথরুমে যাই এবং আমার যা করা দরকার ছিল, তা সংগোপনে সম্পন্ন করি।'

সৌভাগ্যক্রমে জোনস সেবার গর্ভবতী হয়নি। সে বাচ্চার বিষয়ে হতাশ হলেও থেমে থাকেনি জোনস। সে বলে—

'কিন্তু আমার মা হওয়ার ইচ্ছা মরে যায়নি। আমি আমার পরবর্তী সম্পর্কেও এই একই নিকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করি।'

সৌভাগ্যক্রমে জোনস এতটাই অভাগা ছিল যে, দ্বিতীয়বারও সে ব্যর্থ হয়। এরপর সে হাল ছেড়ে দেয়। এটা নারীদের ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বাচ্চার মা হওয়ার উগ্র বাসনার বহিঃপ্রকাশ। সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে লিখেছে। তার মতো নারীরা অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ নিয়ে পুরুষদের কাঁধে দোষের এত বোঝা চাপিয়ে দেয় যে, আমরা সেটা কল্পনাও করতে পারি না। চিন্তা করে দেখুন, সমাজ নারীদের প্রায় অর্ধেকই গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের ব্যাপারে মিথ্যা বলে। অথচ যখন পুরুষরা অবাঞ্ছিত সন্তানের ব্যাপারে অভিযোগ করে, নারীবাদীরা এ কারণে তাদের অপদস্থ করতে ছাড়ে না।

শুক্রাণু চুরির ব্যাপারটা এখন এতটাই সাধারণ হয়ে গিয়েছে যে, নারীরা নিত্যনতুন ফন্দি আবিষ্কার করছে। শওনা কোহেন ২০১১ সালের ২৩ নভেম্বর একটি কলাম লেখে। কলামের বিষয়বস্তু ছিল এমন—

আনেত্রিয়া নামের এক নারী ২০০৭ সালে অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের জন্য তার প্রাক্তন প্রেমিক জো প্রেসিলের শুক্রাণু চুরি করে। যখন সে তাকে তার গর্ভাবস্থার কথা জানায়, তাদের বিচ্ছেদের বয়স তখন তিন মাস। পুরুষ সঙ্গীটি কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করেনি। কারণ, সে সব সময়ই জন্মনিরোধক ব্যবহার করত। তথাপি পিতৃত্ব পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়, সে-ই অনাগত শিশুটির প্রকৃত বাবা। বিষয়টা মূলত কী ছিল? কোহেনের রিপোর্ট অনুযায়ী—

> '২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৩৬ বছর বয়স্ক প্রেসিল ওমেনি মেড ল্যাবোরেটরিজ নামের একটি স্পার্ম ব্যাংক থেকে শুক্রাণু সংরক্ষণের রশিদ পান (প্রেসিলকে একজন রোগী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়, যদিও সে সেখানে কখনোই যায়নি)। ওমেনি মেড-এ ফোন করলে তারা তাকে ল্যাবটির সংযুক্ত ক্লিনিক Advanced Fertility-তে যোগাযোগ করতে বলে। সেখানে যোগাযোগ করলে জানানো হয়, আনেত্রিয়া তার শুক্রাণু নিয়ে ক্লিনিকে এসেছিল এবং তাদের শুক্রাণু টেস্টটিউব পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবহার করে সে গর্ভবতী হয়ে গেছে।'

আনেত্রিয়া প্রেসিলের শুক্রাণু চুরি করে পরবর্তী সময়ে গর্ভবতী হওয়ার জন্য স্পার্ম ব্যাংকের কাছে মিথ্যা বলেছিল। মনে আছে নিশ্চয়ই? জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ৪২% নারী মিথ্যা বলেন। অথচ প্রতারণার মাধ্যমে গর্ভবতী হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোনো বিচারের মুখোমুখি হতে হয় না।

এরচেয়েও জঘন্য একটি বিষয় রয়েছে। মনে করুন, একজন নারী কর্তৃক একজন পুরুষ যৌন হয়রানির শিকার হলো। পরবর্তী সময়ে সে জানতে পারল, ধর্ষক নারীর গর্ভে তার সন্তান রয়েছে এবং আদালত তাকে সেই সন্তানের ভরণ-পোষণ করতে আদেশ দিলো। এক তো পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও সে ধর্ষণের শিকার হয়েছে, আবার জরিমানাও দিতে হবে কড়ায় গন্ডায়। ঠিক এমনটাই ঘটেছিল নিক অলিভাসের সাথে। ১৩ বছর বয়সে নিক ধর্ষণের শিকার হয়। শিশু নিপীড়নকারী ওই মহিলা এরপর একটি সন্তানের জন্ম দেয়। নিকের বয়স তখন মাত্র ১৪ বছর। ২০১৪ সালে অ্যারিজনা চাইল্ড সাপোর্ট অথোরিটি নিককে তখন হাস্যকরভাবে আদেশ দেয়—ধর্ষণকারী মহিলাকে ১৫ হাজার ডলার দিতে হবে সন্তান ভরণ-পোষণের জন্য! এ ধরনের ঘটনা বিরল

হলেও নিক অলিভাসই একমাত্র শিশু নয়, যে তার ধর্ষককে নিজের ঔরসজাত আরেক শিশুর তোষণ বাবত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছিল। অলিভাসের ধর্ষক মহিলাও স্বীয় অপরাধের জন্য কখনো অভিযুক্ত হয়নি।

ফেমিনিস্টদের দ্বিচারিতার কথা বলতে গেলে ডেট রেইপের বিষয়টিও সামনে চলে আসে। নারীবাদী প্ল্যাটফর্মে ডেট রেইপ বিষয়টি বিশাল এক কারবার। নীতির প্রশ্নে এটাকে গুরুতর অভিযোগ বলা যায়। তবে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে নারীবাদীদের 'অ্যালকোহলিক ডেট রেইপ' ক্যাম্পেইন পুরোটাই ভণ্ডামিতে ঠাসা। এই তত্ত্ব অনুসারে একজন নারী যখন অ্যালকোহল সেবন করে নেশাগ্রস্ত থাকে, তখন সে মূলত শারীরিক সম্পর্কের সম্মতি দিতে অক্ষম। কাজেই ফেমিনিস্ট সংস্থাগুলো মাতাল নারীদের সম্মতিতে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে সেটাকে পুরুষ কর্তৃক ধর্ষণ হিসেবে অভিহিত করে থাকে! ফেমিনিস্টদের মধ্যে বিষয়টি বহুল প্রচলিত। ২০১৪ সালে মার্গারেট ওয়েন্ট গ্লোব অ্যান্ড মেইলে একটি কলাম লেখে Can She Consent to Sex After Drinking? শিরোনামে। সেখানে সে বলে—

> 'একজন নারী কি মাতাল অবস্থায় শারীরিক সম্পর্কের সম্মতি দিতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এর উত্তর হলো— না। যদিও এই বাক্যকে লিঙ্গ নিরপেক্ষ হিসেবেই তারা বলেছে, কিন্তু এর মূল আপদটা পুরুষের ওপর দিয়েই যায়। সোজা কথায়—মাতাল অবস্থায় শারীরিক সম্পর্ক করা ধর্ষণতুল্য। এখানে কি কোনো দ্বিচারিতা লক্ষ করেন? নিশ্চয়ই করেন। খুব চতুরতার সাথে এই তত্ত্বে পুরুষদের সম্ভাব্য ধর্ষক এবং নারীদের তাদের অসহায় শিকার হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। যদি দুজন যুবক-যুবতি মদ পান করে এবং মাতাল অবস্থায় যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে যুবকটিই কেবল তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবে। নারী এক্ষেত্রে একান্তই দায়মুক্ত।'

আইনের অধ্যাপক ওয়েন ম্যাক অবশ্য ফেমিনিস্টদের প্রতারণার বিষয়টি স্বীকার করেন না। তিনি সেইন্ট ম্যারি কলেজের জন্য ধর্ষণের ওপর ১১০ পৃষ্ঠার টাস্কফোর্স প্রতিবেদন লিখেছিলেন। ওয়েন্টের কলামটা মূলত সেটারই সমালোচনায় লেখা। মার্গারেট ওয়েন্ট যখন ওয়েন ম্যাকের সাক্ষাৎকার নেয়, সে বলেছিল—

> 'প্রকৃত অবস্থার ওপর আমাদের গুরুত্বারোপ করতে হবে। আর তা হচ্ছে—পুরুষদের আরও উন্নত বোধ-বুদ্ধির অধিকারী হওয়া দরকার, সেইসঙ্গে ধর্ষণ করা থেকে বিরত থাকাও।'

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি, ধর্ষণচর্চা প্রচারের ফলাফল কতটা ভয়াবহ হয়ে থাকে। কলেজ ক্যাম্পাসগুলোতে ন্যায়বিচার প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত পুরুষদের নির্দোষিতা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত দোষী হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে, চিরতরে বহিষ্কার করা হচ্ছে অনেককে। ওয়েস্ট তার কলামে ঠিকই বলেছেন—অ্যালকোহল পানের পর পরস্পরের সম্মতিতে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করাকে ধর্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা মূলত ফেমিনিস্টদের ভণ্ডামি। কারণ, একই যুক্তিতে মাতাল অবস্থায় একজন পুরুষ ব্যক্তিও শারীরিক সম্পর্কের জন্য সম্মতি দিতে পারে না।

আমি কিন্তু কোনো মৃত নারীদের সম্পর্কে আলোচনা করছি না, যাদের মৃতদেহের সাথে যৌনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করা হয়েছে। আমি মাতাল নারীদের কথা বলছি, যারা শারীরিক সম্পর্কে সম্মতি দিয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে ধূর্ততার সাথে সেটাকে ধর্ষণ হিসেবে চালিয়ে দিয়েছে। ভাবখানা এমন যে, মাতাল চালক কাউকে গাড়ি চাপা দিলেও পুরোদস্তুর দায়মুক্ত থাকবে। নারীবাদীরা কি সেক্ষেত্রে বলবেন—মদ্যপ অবস্থায় স্বীয় কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়? কিংবা ধরা যাক, নারীটি স্বাভাবিক এবং পুরুষটি মদ পান করছিল। সেই অবস্থায় পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হলে কি নারীটিকে ধর্ষক বলা হবে? আবার এমনও তো হতে পারে, শারীরিক সম্পর্কে সম্মতি প্রদানের সময় উভয়েই মাতাল ছিল। নারীবাদীদের হাস্যকর যুক্তি মানলে তো সেক্ষেত্রে দুজনেই ধর্ষক!

গোটা বিষয়টিই চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। এই ধরনের ঘটনাকে ধর্ষণ হিসেবে প্রচারণার সবচেয়ে ভণ্ডামিপূর্ণ দিক হচ্ছে—এগুলো বিশ্বব্যাপী নারীবাদী সংস্থাগুলোর দ্বারা অর্থায়িত এবং সমর্থিত। 'মাতাল নারীরা শারীরিক সম্পর্কে সম্মতি দিতে পারে'—এই দাবির মধ্য দিয়ে তারা নারীদের ধোয়া তুলসীপাতা হিসেবে প্রচার করতে চায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, নারীবাদীরা আদৌ চায় না যে নারীরা তাদের কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকুক বা দায়িত্ববোধসম্পন্ন হোক। তাদের বেশির ভাগ বিষয় এমনই বাস্তববিরোধী এবং খোদ নারীদের জন্য অসম্মানজনকও বটে।

আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন—যখন নারী ও পুরুষ একই ধরনের অপরাধ করে, সব সময়ই কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় পুরুষ ব্যক্তিটিকে। সোঞ্জা স্টার এই বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। পেশাসূত্রে তিনি একজন আইনের অধ্যাপক এবং মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের Empirical Legal Studies Center-

এর সহকারী পরিচালক। ২০১২ সালের ২৯ আগস্ট তিনি Estimating Gender Disparities in Federal Criminal Cases নামে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। অধ্যাপক স্টারের অনুসন্ধান মতে—

> 'ফেডারেল ফৌজদারি মামলায় ব্যাপক লিঙ্গবৈষম্য দেখা যায়, যার কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা নেই। নারীদের তুলনায় পুরুষরা গড়ে ৬৩% বেশি দীর্ঘমেয়াদি সাজাপ্রাপ্ত হন। এ ছাড়াও পুরুষদের চেয়ে নারীদের ক্ষেত্রে অভিযোগ ও সাজা এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। তারা দোষী হিসেবে প্রমাণিত হলেও কারাবরণ এড়িয়ে যাওয়ার দ্বিগুণ সম্ভাবনা রয়েছে।'

অস্ট্রেলিয়ার আইন গবেষকরা একই কথা বলেছেন। ডাক্তার সামান্থা জেফ্রিস ও ক্রিস্টিন ই ডাব্লিউ বন্ড ২০১০ সালে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার অপরাধ পরিসংখ্যান ও গবেষণা দপ্তরের সহায়তায় *পিয়ার রিভিউড জার্নাল* 'কারেন্ট ইস্যুজ ইন ক্রিমিনাল জাস্টিস'-এ একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তাদের গবেষণা অনুযায়ী—

> 'সরকারি তথ্যমতে, নারীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পুরুষের কৃত একই অপরাধের চেয়ে কম গুরুতর বিবেচনা করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে এই জাতীয় চিন্তা-চেতনা অনুপস্থিত থাকলেও নারীদের সাজা পুরুষদের চেয়ে কমই হয়ে থাকে। আবার লিঙ্গ ও সাজার তারতম্যের মধ্যেও একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার উচ্চ আদালতে যখন নারী ও পুরুষরা একই অপরাধের জন্য হাজির হয়, নারীদের জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারাবরণ করলেও সেটা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য।'

অবশ্য ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় এই যে লিঙ্গবেষম্য, এক্ষেত্রে কিন্তু ফেমিনিস্টদের হইচই শুনবেন না। সবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খসড়ার দিকে লক্ষ করা যাক। আপনি যদি যুক্তরাষ্ট্রের ১৮ বছর বয়স্ক একজন পুরুষ হয়ে থাকেন, অবশ্যই আপনাকে মিলিটারি সার্ভিসের জন্য নিবন্ধিত হতে হবে। তা না করলে আপনি ভোট দিতে পারবেন না, কলেজের জন্য আর্থিক সাহায্য পাবেন না অথবা কোনো ফেডারেল সংস্থাতে চাকরিও পাবেন না। কিন্তু এই বই লেখার সময় পর্যন্ত মিলিটারি সার্ভিসে নারীদের নিবন্ধন করার প্রয়োজন নেই। কলেজের আর্থিক সাহায্যসহ ওপরের সব সুবিধা তারা বিনা সার্ভিসেই পাবে। এরপরও যখন কোনো নারীবাদী নাকের জল আর চোখের জল একাকার করে আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে—নারীরা কতটা নিগৃহীত, বুঝে নেবেন—তারা ডাহা মিথ্যা কথা বলছে।

নারীবাদ নারীদের জন্যই ক্ষতিকর

নারীবাদের প্রধান দুই শত্রু হলো বিবাহপ্রথা ও পারিবারিক মূল্যবোধ। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীবাদীরা এই দুটিকেই ঘায়েল করতে সক্ষম হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখেছি, ধ্বংসাত্মক ফেমিনিস্টরা পুরুষ ও সমাজের কাঁধে দোষ চাপিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে, পুরুষ দমনের সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। কিন্তু ফেমিনিজম খোদ নারীদের ওপর কী প্রভাব ফেলে, তা নিয়েও আলোচনা করা জরুরি।

দীর্ঘ সময় পর হলেও নারীরা ফেমিনিস্টদের কর্মকাণ্ডের পরিণাম বুঝতে শুরু করেছে। বিয়েপ্রথাকে আক্রমণ করার সময় থেকেই ফেমিনিস্টরা জানত, নারীদের সুখী এবং ভালোবাসাপূর্ণ পারিবারিক জীবন থেকে বের করে আনতে হলে অবশ্যই সামনে একটা মুলা ঝুলিয়ে দিতে হবে। ফলে তারা ক্ষণিকের সুখ লাভের জন্য উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের সুবিধাসমূহ প্রচার করতে শুরু করে। উচ্ছৃঙ্খলতার 'কুফল' রোধকল্পে সমানতালে চলতে থাকে জন্মনিরোধক আর ঢালাও গর্ভপাতের প্রচারণা। অথচ বাস্তব জীবনে যত্রতত্র গর্ভধারণ এবং লাগামহীন উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণাম ভয়াবহ এবং গুরুতর।

সহজ কথায়—নারীবাদীরা জন্মনিরোধক ও গর্ভপাতের মাধ্যমে কুকর্মের প্রাকৃতিক পরিণতি এড়ানোর টোপ দিয়ে নারীদের যথেচ্ছা ও যত্রতত্র শারীরিক সম্পর্কে জড়াতে প্রলুব্ধ করেছিল। এই পরিকল্পনার অভ্যন্তরেই বেশ্যাবৃত্তিকে বলা হয়েছে লিঙ্গবৈষম্যমূলক আর অবাধ যৌনাচারকে দেওয়া হয়েছে শারীরিক স্বাধীনতার তকমা। অদূরদর্শী নারীবাদীরা কখনোই উচ্ছৃঙ্খলতার বিনিময়ে বিয়ে ও পারিবারিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেওয়ার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক পরিণতি বিবেচনা করেনি।

এদিকে সমাজে বাধাহীন বিশৃঙ্খলার প্রভাবে বিভিন্ন অপরাধ এবং মাদকাসক্তি বেড়ে যায়। সমাজ ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে জ্যান্ত নরকে। এগুলো কি বিশেষ কোনো পরিণতি বয়ে আনবে? চলুন সেটাই আলোচনা করা যাক।

প্রথমেই কথা বলি জন্মনিরোধক নিয়ে। আজকাল জন্মনিরোধক পিল এতটাই সহজলভ্য যে, গর্ভধারণ প্রতিরোধ করা ছাড়াও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে ডাক্তাররা ব্রণ প্রতিরোধে, অনিয়মিত মাসিক; এমনকি মাসিকের পূর্বের লক্ষণসমূহের কারণেও এসব পিলের প্রেসক্রিপশন দিয়ে দেন। যদিও সাধারণভাবে জন্মনিরোধক পিল নিরাপদ, কিন্তু এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম নয়। যেকোনো সময় এটি ধ্বংসাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

জন্মনিরোধকের সবচেয়ে প্রধান সমস্যা হলো স্থূলতা। এটা সেবনের ফলে ওজন বেড়ে যায়। কিন্তু বিষয়টাকে বরাবরই লঘু বিবেচনায় এড়িয়ে যাওয়া হয়। এমনকি অনেক বিশেষজ্ঞও একে সমস্যা বলে মনে করে না। তাহলে আমরা কেন এই বিষয়ে কথা বলছি? কারণ, গবেষণায় স্থূলতার পরিবর্তে কেবল সলিড মাস গেইন (গণকল্যাণ) পরিমাপ করা হয়। *সেলফ* ম্যাগাজিনের জাহরা বার্নস একবার The Truth About Birth Control Causing Weight Gain নামে ডাক্তার ইদ্রিস আবদুর রহমানের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৬ সালের ১৩ আগস্ট। ডাক্তার আবদুর রহমানের ভাষ্যমতে—'সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো, এটা ওজন বৃদ্ধি করতে সক্ষম।' এ ছাড়া মাউন্ট সিনাই স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপক ডক্টর অ্যালিসা ডেক বার্নসকে বলেন—'আপনার অবশ্যই অতিমাত্রায় ওজন বৃদ্ধি করা উচিত নয়।'

২০১৪ সালের ২ জানুয়ারি *কোচরান ডেটাবেজ অফ সিস্টেম্যাটিক রিভিউ*-এ প্রকাশিত একটি মেটা স্টাডিতে আরও বলা হয়—

> 'বিভিন্ন ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ওপর পরিচালিত গবেষণায় ওজন বৃদ্ধির বিষয়টি মোটামুটি একই রকম। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কারণে ওজন বৃদ্ধি পায় না—এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার মতো যথেষ্ট প্রমান মেলেনি।'

নারী স্বাস্থ্য জার্নালিস্ট আলেক্সান্দ্রিয়া গোমেজ একবার ইয়েল ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপক ডক্টর মেরি জেন মিনকিনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

তিনি বলেছিলেন—'আজকাল স্থূলতা একটি কমন অভিযোগ। সমস্যা হলো—হরমোনাল জন্মনিরোধকগুলো কেন আপনাকে মোটা বানিয়ে ফেলবে, তা এখনও একটি রহস্য।

ডক্টর মিনকিন নিশ্চিত করেন—হরমোনাল জন্মনিরোধকগুলো কেন ওজন বৃদ্ধি করে, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের তেমন কোনো ধারণাই নেই। তবে এটা সুস্পষ্ট যে, এগুলো ওজন বৃদ্ধিতে সক্ষম। দুঃখজনক ব্যাপার হলো—সবাই বিষয়টি জানা সত্ত্বেও এ প্রসঙ্গে কথা উঠলে আলোচনা অন্যদিকে নিয়ে যায় এবং মূল সংকটটাই ধামাচাপা দিয়ে ফেলে। অথচ এটি একই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত।

ডক্টর জয়শ্রি কুলকর্নি অস্ট্রেলিয়ার আলফ্রেড অ্যান্ড মনাশ ইউনিভার্সিটির একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি শুধু একজন অধ্যাপকই নন; মনাশ আলফ্রেড সাইকিয়াট্রি রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টরও বটে। এটি বিভিন্ন সেক্টরের ১০০ জনেরও বেশি বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত একটি বৃহৎ মনোরোগ গবেষণাকেন্দ্র। ডক্টর কুলকর্নি পিয়ার রিভিউড জার্নাল *এক্সপার্ট অপিনিয়ন অন ড্রাগ সেইফটি*-তে ২০০৬ সালের জুলাই সংস্করণে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তার অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে—

> 'বিশ্বব্যাপী লক্ষাধিক নারী কার্যকর জন্মনিরোধক হিসেবে মুখে সেবনযোগ্য গর্ভনিরোধক পিল ব্যবহার করছেন। এখনও পর্যন্ত এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে কেবল শারীরিক দিককেই গুরুত্ব দেওয়া হয়ে আসছে। অথচ এটি ব্যবহারের অধারাবাহিকতার কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে ডিপ্রেশন বা হতাশার কথা। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে—হতাশার কারণ হিসেবে ওরাল গর্ভনিরোধক পিলের ভূমিকার ব্যাপারে গবেষণা রয়েছে মাত্র হাতেগোনা কয়েকটি। একটি পাইলট গবেষণা প্রকল্প দেখিয়েছে যে, ওরাল গর্ভনিরোধক পিল সেবনকারী নারীরা সাধারণ নারীদের চাইতে উল্লেখযোগ্যমাত্রায় অধিক হতাশাগ্রস্ত ছিলেন।'

২০১৬ সালে অ্যামেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পিয়ার রিভিউড জার্নাল JAMA PSzchiatry হতাশার সাথে হরমোনাল জন্মনিরোধকের সম্পর্ক নিয়ে একটি গবেষণা প্রকাশ করে। এটি মূলত শার্লট ওয়েসেল, স্কোভলুন্ড এমএসসি, ডক্টর লিনা স্টেইনরড মর্চ এবং ডক্টর লার্স ভেদেল কেসিংয়ের পরিচালিত একটি যৌথ গবেষণা উদ্যোগ। গবেষণাটিতে এই ভয়ংকর তথ্য উঠে আসে—

> 'সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ নারী হরমোনাল জন্মনিরোধক ব্যবহার করছেন। কিছু নারীর মন-মেজাজ নিয়ন্ত্রণে এসব ওষুধের প্রভাব থাকার ক্লিনিক্যাল প্রমাণ মেলা সত্ত্বেও হরমোনাল গর্ভ নিরোধকের সাথে মানসিক অস্থিরতার সংযোগ যথাযথ গুরুত্বের সাথে চিহ্নিত করা হয়নি। দেশব্যাপী এক মিলিয়নেরও বেশি নারীর ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের হরমোনাল জন্মনিরোধক সেবনকারীদের মধ্যে হতাশানিরোধক পিল ব্যবহারের ক্রমবর্ধবান ঝুঁকি রয়েছে। প্রথমবার অ্যান্টিডিপ্রেশেন্ট ব্যবহার করছেন—এমন অনেকেই জন্মনিরোধকসেবী। এই হার কিশোরীদের মধ্যে সর্বাধিক।'

বিজ্ঞান এখানে সুস্পষ্ট। হরমোনাল জন্মনিরোধক নিঃসন্দেহে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে জড়িত। তবে এখানেই এর শেষ নয়। গবেষণায় পাওয়া যায়, জন্মনিরোধক সেবনের ফলে নারীদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিও বেড়ে যেতে পারে। *The Susan Komen Foundation* স্তন ক্যান্সারের অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটিকেও একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে এভাবে—

> 'সাম্প্রতিক সময়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পিলের ব্যবহার স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি করছে। গবেষণা দেখিয়েছে—যখন নারীরা গর্ভনিরোধক পিল সেবন করেন, তাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় ২০-৩০ শতাংশ বেশি।'

যদিও ফেমিনিস্টরা গণহারে নারীদের জন্মনিরোধক ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করছে, এর ভয়াবহ পরিণতি যে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি, সেটা একবারও বলছেন না; বরং প্রতিনিয়ত এসব বাস্তব তথ্যকে তারা ছোটো করে দেখায় এবং অগ্রাহ্য করে। কেননা, এসব বাস্তব তথ্যাবলি তাদের বক্তব্যকে ধসিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এবার গর্ভপাতের কুফলের ওপর আলোকপাত করা যাক।

দীর্ঘ সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব মেডিকেল বিশেষজ্ঞ এই ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, গর্ভপাতের সাথে ক্রমবর্ধমান ক্যান্সারের সম্পর্ক নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বিষয়টি একেবারেই ভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। মানবদেহে ক্যান্সারবিষয়ক আন্তর্জাতিক পিয়ার রিভিউড জার্নাল *Cancer Causes and & Control*-এর ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সংস্করণ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে A Meta-Analysis of the Association Between Induced

Abortion and Breast Cancer Among Chinese Females শিরোনামে। গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন জাতীয়ভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন সংস্থার ১৩ জন বিশেষজ্ঞ মিলে। বুঝতেই পারছেন, এই গবেষণা কিছু নির্বোধ ব্যক্তিরা ঘরে বসে সম্পন্ন করেনি। এটি চীনের অনেকগুলো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের পরিচালিত একটি গবেষণা। তাদের প্রাপ্ত ফলাফলও ছিল ভয়ংকর। তারা উপসংহার টেনেছেন এভাবে—

> 'চাইনিজ নারীদের মধ্যে অহেতুক গর্ভপাতের সঙ্গে স্তন ক্যান্সারের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পৃক্ত। স্বতঃপ্রণোদিত গর্ভপাতের (Induced Abortion) সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্তন ক্যান্সারের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চীনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ক্যান্সার চিকিৎসা ও গবেষণা কেন্দ্রগুলোর ১২ জনেরও বেশি বিশেষজ্ঞের মতানুসারে—একজন নারী যত বেশি মাত্রায় গর্ভপাত ঘটায়, স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি তত বেড়ে যায়। উপরন্তু ২০১৫ সালের ৭ এপ্রিল আমেরিকার শিশু বিশেষজ্ঞ কলেজ Know Your ABC : The Abortion Breast Cancer Link নামে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এতে বলা হয়—

> 'আমেরিকার শিশু বিশেষজ্ঞ কলেজ নারীদের প্রাথমিক বিষয়গুলো জানার আহ্বান জানাচ্ছে। স্তন ক্যান্সারের সাথে গর্ভপাত সম্পর্কিত। যদিও মেডিকোল কমিউনিটি এই সম্পর্ক মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকে। ফুল টার্ম ডেলিভারির পূর্বে এবং গর্ভধারণের ৩২ সপ্তাহের মধ্যে স্বতঃপ্রণোদিত গর্ভপাত একজন নারীর স্তন ক্যান্সার আক্রান্তের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। বিশেষত কিশোরীদের জন্য এই ঝুঁকি আরও বেশি।'

পরবর্তী সময়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তিটিতে সিয়াটল শিশু হাসপাতালের ক্যান্সারবিশেষজ্ঞ ডক্টর রেবেকা জনসনের সম্পাদিত একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করা হয়। তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন—

> 'প্রমাণিত তথ্য-উপাত্ত এই ইঙ্গিত দেয় যে, পূর্ণকালীন গর্ভধারণের পূর্বে গর্ভপাতের কারণে বিশ্বজুড়ে ক্যান্সারের হার উচ্চমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। বর্তমান গবেষণা অকালে গর্ভপাত এবং স্তন ক্যান্সারের মধ্যে জোরালো সংযোগ প্রদর্শন করছে। একটির কারণে আরেকটির ওপর প্রভাব পড়ছে। যদিও আরও অনেক গবেষণা হবে, কিন্তু কিশোরীদের

এখন এই ঝুঁকি সম্পর্কে জানাটা জরুরি। সকল কিশোরী এবং তাদের পিতা-মাতার স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে আমেরিকার শিশুবিশেষজ্ঞ কলেজ সুপারিশ করছে—সব মেডিকেল বিশেষজ্ঞরা যেন এই তথ্য ছড়িয়ে দেন। কন্যাদের এই তথ্য বাবা-মায়ের বিশদভাবে বলা উচিত। সমস্ত স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষকদের উচিত যে, কোনো স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্লাসে এই তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা।'

এরচেয়ে ভয়ংকর কিছু আর হতে পারে না। নিশ্চিতভাবেই উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধির ফলে জন্মনিরোধকের ব্যবহার এবং সেইসঙ্গে গর্ভপাত বেড়ে যাচ্ছে। এবং উভয়টিই নারীদের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, উচ্ছৃঙ্খলতা আরও অনেক উপায়ে নারীদের ক্ষতিসাধন করছে। ডক্টর ক্রিস ইলিয়েডস ২০১০ সালের ১৫ জুনে এভরিডে হেলথে লেখেন—'আপনার যৌনসঙ্গীর সংখ্যা যত বেশি; এইডস, প্রোস্টেট ক্যান্সার, জরায়ু ক্যান্সার ও ওরাল ক্যান্সারের মতো যৌনবাহিত জীবনসংহারী রোগের ঝুঁকিও তত বেশি।'

তিনি আরও বলেন—'উচ্ছৃঙ্খলতা হচ্ছে উচ্চমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ আচরণগুলোর একটি। এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে অত্যধিক মদ্যপান, জুয়া, অন্যান্য রোমাঞ্চকর আচরণ যেমন : দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানোর মতো ঝুঁকিপূর্ণ আচরণগুলোকে।'

তবে এই বিষয়টি ২০ বছর পূর্বেই জানা গিয়েছিল, যখন ১৯৯২ সালে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের জনস্বাস্থ্য বিভাগ 'নারী কলেজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাধিক যৌনসঙ্গী বাছাই যৌন রোগের ঝুঁকির কারণ' শিরোনামে একটি গবেষণা প্রকাশ করেছিল। সেই গবেষণায় বলা হয়েছিল—

> 'একাধিক যৌনসঙ্গী বাছাই যৌন রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে বলে মনে করা হয়। তবে এই প্রক্রিয়া ইতঃপূর্বে চিকিৎসাধীন ব্যক্তির বাইরে কারও ওপর যাচাই করা হয়নি। যৌনসঙ্গীর সংখ্যা এবং যৌনবাহিত রোগে সংক্রমিত হওয়ার মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ রয়েছে। যেসব নারীর যৌনসঙ্গী একজন, তাদের চেয়ে যেসব নারীর পাঁচ বা ততোধিক যৌনসঙ্গী আছে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যৌন রোগের সম্ভাবনা আট গুণ বেশি। অধিকহারে যৌনসঙ্গী বাছাই এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই যৌনসংগম বৃদ্ধির সাথে সাথে যৌনবাহিত সংক্রামক রোগের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।'

আমরা জানি, আমেরিকাতে বয়স ২০ না পেরোতেই বহু নারী পাঁচজনেরও বেশি যৌনসঙ্গী বানিয়ে ফেলে। যৌন সংক্রামক রোগীর সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধির হার আশঙ্কাজনক। ২০১৫ সালের ১৭ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে—

> '২০০৬ সালের পর প্রথমবারের মতো দেশব্যাপী যৌনবাহিত সংক্রামক রোগ ক্লামিডিয়া, গনোরিয়া ও সিফলিস উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যৌন সংক্রামক রোগগুলো তীব্রভাবে আক্রান্ত করছে তরুণদের, বিশেষত নারীদের। নারীদের সংক্রমণ ২০১৪ সালে এই তিনটি রোগের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে মারাত্মক অবদান রেখেছিল।'

২০১৪ সালের উপাত্ত থেকে এটাও জানা যায়—তরুণদের মধ্যে এখনও যৌন সংক্রামক রোগ বিশেষ করে ক্লামিডিয়া ও গনোরিয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। যৌনসক্রিয় জনসংখ্যার তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র অংশ হওয়া সত্ত্বেও ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি তরুণরা ২০১৪ সালে সবচেয়ে বেশি হারে ক্লামিডিয়া ও গনোরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। এ ছাড়াও পূর্ববর্তী গবেষণাগুলো থেকে জানা যায়, প্রতিবছর যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত প্রায় ২০ মিলিয়ন রোগীর অর্ধেকই এসব কলেজপড়ুয়া তরুণ-তরুণী। সিডিসি এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরোধমূলক পরিষেবা টাস্ক ফোর্স ২৫ বছরের কম বয়সি যৌনসক্রিয় নারীদের বাৎসরিক রোগ ক্লামিডিয়া ও গনোরিয়া পরীক্ষার জন্য সুপারিশ করলেও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, অসংখ্য তরুণের রোগ পরীক্ষাই করা হয়ে ওঠে না। ফলে তারা জানেও না যে তারা আক্রান্ত।

বর্তমানে উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তির কল্যাণে এই তিনটি রোগই নিরাময়যোগ্য। তারপরও সিডিসি কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যৌন সংক্রামক রোগের ক্রমবর্ধমান হার নিয়ে উদ্বিগ্ন? কারণ তারা জানে, যত বেশিসংখ্যক মানুষ যৌন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে, তত বেশি এইচআইভি রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে। সিডিসির বার্তা খুবই সুস্পষ্ট। একজন ব্যক্তির যত বেশি যৌনসঙ্গী থাকবে, তার যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। ভুলে যাবেন না, সিডিসি ও মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েই বলেছে—এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে নারীরা। কেন তারা বেশি অনিরাপদ?

২০০৮ সালের ৯ ডিসেম্বর পল সিমস *ডেইলি মেইল*-এ প্রকাশিত তার **In the Age of Promiscuity, Women Have More Sexual Partners Than Men**

শীর্ষক কলামে সেই প্রশ্নের জবাব দেন। *More Magazine*-এর একটি গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন—'গবেষকদের তথ্য অনুযায়ী, নারীরা দিনদিন অধিক উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে। পুরুষদের চেয়ে তাদের যৌনসঙ্গী অনেক বেশি।'

২১ বছর বয়সের মধ্যে তারা গড়ে ৯ জন প্রেমিকের সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়। এবং এক-চতুর্থাংশ নারী কুমারীত্ব হারানোর পর থেকে পাঁচ বছরে এক-পঞ্চমাংশ তরুণের তুলনায় ১০ জনেরও বেশি সঙ্গীর সাথে সংগম করে। এ ছাড়াও তরুণীদের বিশ্বাসঘাতক আচরণ করার সম্ভাবনা প্রায় দ্বিগুণ। এর মধ্যে সঙ্গীর সাথে প্রতারণার কথা স্বীকার করে ৫০ শতাংশ। গবেষণাটি আরও খুঁজে পায়—অর্ধেক নারীই যাদের কাছে কুমারীত্ব হারিয়েছিল, তাদের প্রতি প্রেমের কোনো অনুভূতি ছিল না। প্রতি ১০ জনের মধ্যে সাতজনের ক্ষেত্রেই এটা ছিল নিছক ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড। প্রতি চারজনে একজন টাকার জন্য এবং ৩৯ শতাংশ নারী শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়েছিল পদোন্নতির জন্য।

এ ছাড়া ২৭ শতাংশ নারী বিবাহিত পুরুষের সাথে এবং ১৪ শতাংশ নারী তাদের বেস্ট ফ্রেন্ডের সঙ্গীর সাথে যৌন সম্পর্কে জড়ানোর কথা বলে। সুস্পষ্টভাবেই নারীবাদীদের অবাধ যৌনাচার আন্দোলন এক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। এখানেই এর শেষ নয়। মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রভাব অনস্বীকার্য। ডক্টর সুসান ক্রাউস হুইটবার্ন *সাইকোলজি টুডে*-তে প্রকাশিত তার দুটি কলামে এই বিষয়ে কথা বলেছেন। প্রথম কলামটি প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালের ৯ মার্চ, How Casual Sex Can Affect Our Mental Health শিরোনামে। তার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী—

> 'উদ্দেশ্যহীন যৌন সম্পর্কের বিস্তৃত এক গবেষণার পর কিনসে ইনস্টিটিউটের গবেষক জাস্টিন গার্সিয়া এবং তার দল সিদ্ধান্তে আসেন—অবাধ যৌন সম্পর্ক (Hookups) একটি জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক পালাবদলের অংশ, যা পশ্চিমা বিশ্বে তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে। অবাধ যৌন সম্পর্ক মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গুরুতর প্রভাব ফেলে। যেসব ব্যক্তি উদ্দেশ্যহীন শারীরিক সম্পর্কে জড়িত হয়, তাদের প্রত্যেককেই এর মানসিক পরিণাম ভোগ করতে হয়। এর প্রভাব শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের দীর্ঘদিন পরেও রয়ে যায়। যেসব গবেষক মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে অবাধ যৌনাচারের সংযোগের নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন, তারা আরও রিপোর্ট করেন—

যেসব ব্যক্তি পূর্বে হতাশ ছিল না, উদ্দেশ্যহীন যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পর তাদের মধ্যে অনেক বেশি হতাশার লক্ষণ এবং একাকিত্ব লক্ষ করা যায়। যারা যত বেশি অবাধ যৌনাচারে জড়িত, তাদের মানসিক যন্ত্রণা তত বেশি।'

সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাদকাসক্তি কী ধরনের প্রভাব ফেলে? ড্রাগ ও অ্যালকোহল পুনর্বাসনকেন্দ্র তাদের alcoholrehab.com ওয়েবসাইটে খোলাখুলিভাবে এর উত্তর দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে—'অ্যালকোহল ও ড্রাগ অপব্যবহারের ফলে অনেক সমস্যার সূত্রপাত হয়। এসব অপব্যবহারের অন্যতম আসন্ন বিপর্যয় ঘটবে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ক্ষেত্রে। মানুষের পক্ষে মন পরিবর্তনকারী পদার্থের অপব্যবহার করে অটুট সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব নয়। একজন ব্যক্তি বেশি মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে এটা সম্পূর্ণভাবে তার জীবন দখল করবে এবং তার জীবনে আর অন্য কারও জন্য জায়গা থাকবে না। কারণ, মাদকাসক্ত ব্যক্তি বিভ্রম ও আচ্ছন্নতায় ডুবে থাকে। তারা যতদিন পর্যন্ত মাদক পরিহার না করবে, ততদিন এর কোনো পরিবর্তন অসম্ভব। এমনকি এখান থেকে আরোগ্যলাভের পরেও অন্তরঙ্গ এবং স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক উপভোগ করার সক্ষমতা ফিরে পেতে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।'

এ বিষয়টাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বেথ ওয়াটসন ২০১৩ সালের ২১ আগস্ট থেকে 'উচ্ছৃঙ্খলতা কি আত্মহননের ভিন্ন রূপ?' নামে একটি ব্লগ পোস্ট লিখতে শুরু করেন। তার মতে, পিতৃহীন কন্যাদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা এখন আত্মহননরূপে আবির্ভূত হয়েছে। অন্য বিশেষজ্ঞদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন—'যে কন্যারা পিতৃহীনভাবে বেড়ে ওঠে, তাদের পক্ষে যৌন আচরণ এবং সমস্ত অসৎ জায়গায় বৈধতা খোঁজা অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

পিতৃহীন কন্যাদের মধ্যে প্রায়ই সাধারণ চর্চা হিসেবে উচ্ছৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হয় এবং এর সম্ভাব্য কারণ পিতার অভাব। ক্যাপিট্যাল প্রিপারেটরি ম্যাগনেট বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাটা ডক্টর স্টিভ পেরিও পিতৃহীন কন্যাদের নিয়ে কাজ করার সময় একই বিষয় লক্ষ করেছেন। বলেছেন—'উচ্ছৃঙ্খলতাই প্রধান বিষয়। প্রায়শই আমরা যখন মানসিক যন্ত্রণাগ্রস্ত তরুণীদের দিকে লক্ষ করি, তাদের স্ববিকৃতিকে বিদ্রুপপূর্ণ হিসেবেই চিন্তা করি। এটা সত্যিই বিদ্রুপপূর্ণ বটে, তবে স্ববিকৃতির আরেকটি অর্থ হলো—অন্য কাউকে আপনার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া।'

নারীবাদীরা তাদের লাগামহীন মিথ্যাচার প্রচারের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাইছে—বিশৃঙ্খলতার অর্থ পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা। অবাধ যৌনাচার আন্দোলনকে ব্যবহার করে তারা ইতোমধ্যে বিবাহপ্রথা এবং পারিবারিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে একটি বিশৃঙ্খল সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটিয়েছে, যেটা সিডিসির মতে—যৌনব্যাধি সৃষ্টি এবং আশঙ্কাজনক হারে তা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

উদ্দেশ্যহীন যৌন সম্পর্কের সপক্ষে ফেমিনিস্টদের দীর্ঘমেয়াদি ক্যাম্পেইন নারীদের ক্ষতিকর জন্মনিরোধক পিল সেবনে প্ররোচিত করছে, তৈরি করছে ক্রমবর্ধমান মানসিক সমস্যা। উপরন্তু গবেষকগণ বলছেন—একজন ব্যক্তির যত বেশি যৌনসঙ্গী রয়েছে, তার মাদকাসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। সর্বোপরি জন্মনিরোধক এবং গর্ভপাত অবলম্বনের মাধ্যমে সৃষ্ট উচ্ছৃঙ্খলতা সন্দেহাতীতভাবে নারীদের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। যদিও ফেমিনিস্টরা এসব সংকটের পেছনে নিজেদের দায় অস্বীকার করে, কিন্তু তাদের সেসব মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য নারীবাদীদের সংগঠিত ও অর্থায়িত Slut Walks-এর কার্যক্রমের দিকে লক্ষ রাখাই যথেষ্ট। নারীবাদীরা যতই মিথ্যা বলুক না কেন, বাস্তবতা হলো—উচ্ছৃঙ্খলতার সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি রয়েছে।

নারীবাদের প্রতিক্রিয়া

ফেমিনিস্টরা শুরু থেকেই বুঝতে পেরেছিল, নারীবাদকে আন্দোলন হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কেবল নিজেদের মতামতই যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে তাদের পরিকল্পনা ছিল পুরুষ সহযোগীদের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা। সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে এবং তাদের মতবাদ ছড়িয়ে দিতে অন্যান্য আন্দোলনকেও সমর্থন দেওয়া। এসব পুরুষ সহযোগী নারীবাদীদের নিকট মেল ফেমিনিস্ট হিসেবে পরিচিত। তবে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তাদের দুর্বল, নারীঘেঁষা বা অসৎ পুরুষ হিসেবেই দেখে থাকে। তাদের সম্পর্কে মানুষের এমন দৃষ্টিভঙ্গির কারণ কী? এর কারণ পুরুষ নারীবাদীরা সহযোগী হিসেবে কাজ করেন না। কার্যত তারা ব্যবহৃত হয় নারীবাদীদের চামচা ও অনুগত গর্দভ হিসেবে।

অধিকাংশেরই ধারণা থাকে—কীভাবে ফেমিনিস্টদের অন্দরমহলে প্রবেশ করা যায়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ঠাঁই হয় 'বন্ধুমহলে'। অনেক সময় তাও জোটে না। তবে এমন মেল ফেমিনিস্ট অবশ্যই আছে, যারা নারীবাদীদের সাথে বাস্তবিকই সম্পর্কে জড়ায়; এমনকি কেউ কেউ তাদের বিয়ে করতেও সমর্থ হয়। যখন এমন কিছু ঘটে, এর পেছনে কারণ হিসেবে থাকে সেই দুর্বল পুরুষের অতিশয় ভালো বেতনের চাকরি, উচ্চ সামাজিক মর্যাদা কিংবা উভয়টিই। লম্পট পুরুষ নারীবাদীরা এতটাই মগজ ধোলাইয়ের শিকার যে, নিজেদের অবস্থানের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ এবং ধ্বংসলীলা তারা অনুধাবন করতে পারে না।

মেল ফেমিনিস্ট নিয়োগের একটি উদাহরণ হলো 'হি ফর শি' আন্দোলন। এটি লিঙ্গসমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি

বিশ্বব্যাপী প্রচারণা অভিযান। এর লক্ষ্য হলো—নারীদের আঁচলতলে থেকে তাদের স্বার্থোদ্ধার করার জন্য পুরুষদের খাটানো। এই আন্দোলনের নাম থেকেই সেটা সুস্পষ্ট।

আদতে এর নাম দেওয়া উচিত ছিল Cucks for Chicks (মুরগিরক্ষক শেয়াল)। এই আন্দোলনের মুখপাত্র কে ছিল? একজন অতিশয় ধনী এবং স্বঘোষিত অভিনেত্রী এমা ওয়াটসন। তিনি দাবি করেন, নারীরা পুরুষের সমকক্ষ নয় এবং সব সময়ই তাদের সাহায্যের প্রয়োজন। স্বীয় ধনদৌলত পরিষ্কারভাবেই তার কথার কপটতা ও প্রতারণা প্রকাশ করছে। যদি সে একজন সফল ধনকুবের হতে পারে, তাহলে অন্য নারীরাও সময় ও প্রচেষ্টার সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে সেটা হতে পারবে না কেন? খোদ ফেমিনিস্ট এবং এর বাইরেও এই আন্দোলনের সমালোচক রয়েছে।

ফেমিনিস্টদের অনেকেই আন্দোলনের চরিত্রের ব্যাপারে ক্রোধান্বিত; কারণ এই আন্দোলন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে না। এমনকি সাধারণ নারীবাদীরা মনে করেন, এই আন্দোলনের নামটাই নারীদের প্রতি বিদ্বেষমূলক। কেননা এটা দাবি করে, নারীদের জন্য পুরুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। নারীবাদী ও অনারীবাদী সমালোচকদের বিরাট অংশের মতে, এই অভিযান চূড়ান্ত ভণ্ডামিপূর্ণ।

দুঃখজনকভাবে নারীবাদ সমর্থনকারী পুরুষেরাও ভণ্ড। তারা নিজেরাও নারীবিদ্বেষী। নারীদের তারা নিজেদের সমকক্ষ মনে করে না; বরং ডিভোর্স কিংবা ধর্ষণ মামলায় ফেঁসে যাওয়ার আগপর্যন্ত তাদের সংবেদনশীল হিসেবেই দেখে থাকে। কোনো কোনো কনজারভেটিভ স্টেটগুলোতে 'কতিপয় ফেমিনিস্ট পুরুষেরাই' নারীবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। তাদের প্রতিবাদের ফলেই সেখানে পুরুষদের বিরুদ্ধে বৈষম্যসূচক ফেমিনিস্ট আইনগুলো পাশ হতে পারেনি। ফেমিনিস্ট পুরুষ ও নারীদের মধ্যে এমন কিছু কিছু বিষয় আছে, যেগুলো অধিকতর মূর্খতাপূর্ণ এবং নিজ স্বার্থবিরোধী।

আপনারা যদি ডিভোর্স, রেপ নিয়ে মজা করেন এবং চিন্তা করে থাকেন—আপনার সাথে এমনটি হবে না, তাহলে বোকার স্বর্গে বাস করছেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমি কিছু সফল প্রভাবশালী পুরুষের উদাহরণ দিয়েছিলাম, স্ত্রীরা যাদের ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে লক্ষ লক্ষ ডলার হাতিয়ে নিয়েছে। যদি আপনার উত্তর হয়—'তাদের যৌন সক্ষমতা ছিল না', আপনি এখনও নির্বোধের

মতো চিন্তা করছেন। জনি ডেপ ও ব্রাড পিটকে ধরা হতো দুনিয়ার সবচেয়ে আবেদনময় পুরুষ। অসংখ্য নারীরা প্রকাশ্যে তাদের কাছে নিজেদের সোপর্দ করতে চাইত। এই দুই মেগাস্টারই একসময় বিয়ে করেছিল। কিন্তু যথেষ্ট সফল ও সুপুরুষ হওয়া সত্ত্বেও তারা দুজনেই নিজেদের ফেমিনিস্ট স্ত্রীদের দ্বারা মিথ্যা ডিভোর্স রেপের মামলায় পুরস্কৃত হয়েছিলেন। মূল কথা—বিবাহিত ফেমিনিস্টরা প্রায় সব সময়ই তাদের স্বামীর বিরুদ্ধে ডিভোর্স রেপ মামলা করে থাকে। এটা প্রায় নিয়মিত ঘটে। ফেমিনিজমের বিরুদ্ধে এসব ন্যায্য সমালোচনার প্রতিক্রিয়া কী?

প্রথমত, তারা সব সময়ই সমালোচককে ব্যক্তিগত আক্রমণের মাধ্যমে অপমান করে। যুক্তির পালটা যুক্তি না দিয়ে চেষ্টা করে আলোচনার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে। *এবরিডে ফেমিনিজম*-এর লেখিকা শ্যানন রিজওয়ে 'ধর্ষণ কালচারের দৈনন্দিন ২৫টি উদাহরণ' শিরোনামে একটি কলাম লিখেছিলেন। তিনি সেখানে আলোচনার মোড় অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা চালিয়েছেন 'ধর্ষণ কালচার সত্য'—এই ভুঁইফোঁড় মিথ্যাচার প্রচারের মাধ্যমে। অথচ নারীবাদী সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও RAINN মার্কিন বিচার বিভাগে ধর্ষণ কালচারকে অস্বীকার করেছে। তবুও *এবরিডে ফেমিনিজম* প্রতিনিয়ত এই মিথের প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। রেপ কালচার কীভাবে তৈরি হয়, তার উদাহরণ দেখাতে গিয়ে শ্যানন বলেন—'যেসব কলেজ ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগ করে, তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা।'

শ্যানন ও *এবরিডে ফেমিনিজম* এখানে একটি বিষয় এড়িয়ে যাচ্ছে। কেউই দাবি করছে না, ধর্ষণের প্রতিটি অভিযোগই মিথ্যা। সমালোচকরাও এ কথা বলেননি যে, ধর্ষণের অভিযোগকারী নারীরা সকলেই মিথ্যাবাদী। তবে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে দেখেছি—সবাই না হোক, তাদের অধিকাংশই জলজ্যান্ত মিথ্যুক। বাস্তবে ধর্ষণ কালচারের অস্তিত্ব না থাকলেও অনেকেই নির্বোধের মতো সেই পুরোনো ক্যাসেট বাজিয়ে চলেছে। এই তো সেদিন হাফিংটন পোস্টে ইভ অ্যানস্লার নামক এক অতি উৎসাহী The Undeniable Rape Culture of Donald Trump নামে একটি কলাম লেখেন। তার পুরো কলামটিই ছিল ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ট্রাম্পকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপনের জন্য রচিত। ট্রাম্পের প্রচারণা থামিয়ে দিতে ইভের এই প্রচেষ্টা ছিল বেশ গুরুতর, যদিও এর সাথে বাস্তবতার ন্যূনতম যোগ নেই। কলামটিতে সে একগাদা অভিযোগ তুলে দাবি করে—'এগুলো সবকিছুই রেপ কালচার!'

ধর্ষণ কালচার ধারণাটি ইতোমধ্যেই ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তথাপি আমরা এই ধরনের ভুয়া সংবাদ-কলাম সর্বত্র দেখতে পাই। নারীবাদীরা বাস্তবে বাতিলকৃত এই ধর্ষণ কালচারের মিথ্যা প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে পুরুষদের অন্যায়ভাবে দোষারোপ ও হেয় করে, একে অব্যর্থ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে মতাদর্শিক শত্রুদের বিপক্ষে। যখনই ফেমিনিস্টদের কপটতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে, নিজেদের ভুলগুলো না শুধরে বারবার অধিকতর নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে তারা। সেটা কীভাবে?

Manspreading ছিল পুরুষদের বিরুদ্ধে ফেমিনিস্টদের তৈরি হাস্যকর একটি প্রচারাভিযান। কিছু পুরুষ বসার সময় গোপনাঙ্গের অস্বস্তি এড়াতে পা ছড়িয়ে বসত। নারীবাদীরা একত্রিত হয়ে এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের দাবি অনুযায়ী এভাবে বসাটা নাকি লিঙ্গবৈষম্যমূলক! তবে শুধু নারীবাদীরাই এই নির্বোধ পাগলামি শুরু করেনি। তাদের সাথে সানন্দে শরিক হয়েছিল মূর্খবৎ পুলিশ প্রশাসনও। এটাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে রীতিমতো গণগ্রেফতার শুরু করেছিল তারা। বিষয়টা এতদূর গড়ায় যে, নিউইয়র্ক ট্রানজিট কর্তৃপক্ষ এর জন্য Anti-Manspreading পাবলিক সার্ভিস ঘোষণা করে। কেবল নিউইয়র্কই এই পাগলামি করেনি, পশ্চিমা বিশ্বের অন্যান্য পুলিশ বিভাগগুলোও এই বিশেষ অলিম্পিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পুরো প্রচারাভিযানটাই ছিল পুরুষদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক।

কেবল Manspreading-ই শেষ নয়, এরপর আরও বহু হম্বিতম্বি ছিল। এর মধ্যে রয়েছে ডাহা মূর্খতাপূর্ণ 'সেক্সিস্ট অফিস টেম্পারেচার'। বস্তুত নারীবাদীরা এত নিকৃষ্ট-নির্বোধ ও গোঁড়ামিপূর্ণ প্রচারাভিযান শুরু করেছিল যে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করাটাই ছিল কঠিন চ্যালেঞ্জ। মিথ্যার বেসাতি ছড়িয়ে হলেও সামাজিক ন্যায়বিচার আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল তারা। এলোমেলোভাবে সংগঠিত অসংখ্য আন্দোলনকে তারা 'সামাজিক ন্যায়বিচার' শীর্ষক ছাতার নিচে একতাবদ্ধ করেছিল। এতে যুক্ত ছিল সমকামী নারী আন্দোলন, সমকামী পুরুষ আন্দোলন, বাতিলকৃত তৃতীয় লিঙ্গ আন্দোলন এবং প্রতিনিয়ত ক্রমবর্ধমান ইন্টারসেকশনাল নারীবাদী আন্দোলন। ইন্টারসেকশনাল নারীবাদীরা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল। কেননা বর্ণ, ধর্ম, বয়স, ভূমি, জাতীয়তা ও সুবিধাজনক আরও বিভিন্ন উপায়ে নারীবাদীদের বিভক্ত করেছিল এই আন্দোলন। সুতরাং বলা যায়, ইন্টারসেকশনাল নারীবাদের কারণেই নতুন নারীবাদী উপ-আন্দোলন শুরু হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে আফ্রো-আমেরিকান নারীবাদী, লাতিনা নারীবাদী, এশিয়ান নারীবাদী, আদি আমেরিকান নারীবাদী, অক্ষম নারীবাদী,

তৃতীয় লিঙ্গ নারীবাদী এবং আরও অসংখ্য বিকাশমান নতুন নতুন দল-উপদল। বছরখানেকের মধ্যে কেকস্থানি নারীবাদী আন্দোলন গঠিত না হলেই বরং আমি অবাক হব।

এসবের মাঝে সবচেয়ে সরেস ব্যাপার হলো—নিজেদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাদের অজান্তেই ভুক্তভোগী এবং নিপীড়ন প্রতিযোগিতা তৈরি করেছে। এবং কে সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত, সেটার সিদ্ধান্ত নিতে নারীবাদী সংগঠনগুলো একটি আরেকটির সাথে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। হাস্যকরভাবে তারা অদ্যাবধি নিজেদের মধ্যে চলমান নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বেরই কোনো সুরাহা করতে পারেনি।

এই প্রচারাভিযানের সদস্যরা বিদ্রুপাত্মকভাবে নিজেদের সামাজিক ন্যায়বিচার যোদ্ধা হিসেবে অভিহিত করে। তবে কেউ তাদের সদস্যপদের দিকে লক্ষ করলে সুস্পষ্টভাবেই দেখতে পাবে, সামাজিক ন্যায়বিচার আন্দোলনটি মূলত একটি স্ববিভাজিত পাগলাগারদ। কার্যত, সামাজিক ন্যায়বিচার যোদ্ধারা তাদের ভাবাদর্শকে রক্ষা করতে নিতান্ত অনুপযুক্ত। এজন্যই তারা ভিন্নমত পোষণকারীদের সাথে খোলাখুলি ও প্রকাশ্যে যুক্তিতর্কে জড়াতে অস্বীকৃতি জানায়।

এই অস্বীকৃতি মূলত তাদের অপারগতা ও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিপ্রসূত। প্রকাশ্য ভুল প্রমাণিত হলেও তারা সেটা মেনে না নিয়ে শিশুসুলভ আচরণ করে। তবে দেরিতে হলেও সামাজিক ন্যায়বিচার যোদ্ধারা বুঝতে পেরেছিল, তাদের এই কার্যক্রমকে সম্ভবত ইতিবাচকভাবে দেখা হয় না। কিন্তু এরপর আদর্শগত মতবাদ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে পরিমার্জন করার পরিবর্তে বিরোধীদের দমন করার পথে হেঁটেছিল তারা। ব্যাপক শোরগোলের মধ্য দিয়ে এটি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। তাদের গ্রুপের বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত নারীবাদীরা বিরোধীদের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শনমূলক প্রচারাভিযান শুরু করে। একই সঙ্গে অসংখ্য প্রতিবন্ধী সামাজিক ন্যায়বিচার যোদ্ধা এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা রাস্তায় বিরোধী মতাদর্শীদের বিপক্ষে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখে। এসব গোঁড়ামির এটাই শেষ নয়। কখনো কখনো তাদের নির্বুদ্ধিতা হতবাক করে দিত সবাইকে।

১৯৫০-৬০ সালে নাগরিক অধিকার নেতারা আশেপাশের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল। এটা সেই সময়ের কথা, যখন কৃষ্ণাঙ্গদের পৃথকীকরণ আইন মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহকে ভাবা হতো মারাত্মক অপরাধ। এমনকি বাসের মতো অবাধ গণপরিবহনেও কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবেশ সীমিত করে দেওয়া হয়েছিল। সরকারি স্কুল, কলেজ ও প্রতিষ্ঠানে যাওয়া থেকেও বঞ্চিত ছিল তারা। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মূল নাগরিক অধিকার

নেতারা বাক্‌স্বাধীনতা রক্ষা, পৃথকীকরণ, জাতিগত সহিংসতা এবং গোঁড়ামি বন্ধ করার জন্য প্রতিবাদ করছিল। সামগ্রিকভাবে তাদের সেই প্রতিবাদকে ব্যর্থ বলার সুযোগ নেই।

এবার ২০১৭ সালের দিকে লক্ষ করা যাক। এ সময়ের সামাজিক ন্যায়বিচার আন্দোলন কর্মীরা নিরাপদ পরিবেশের নামে পৃথকীকরণ সমর্থন করেছে। শ্বেতাঙ্গ এবং ভিন্ন মতাদর্শীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক অসংখ্য অপরাধ করার পক্ষে নিজেরা কথা বলেছে এবং তাদের সমর্থকদেরও এ কাজে উৎসাহ দিয়েছে। সর্বোপরি তারা সক্রিয়ভাবে বাক্‌স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে। ১৯৬০ সালে বার্কলে বাক্‌স্বাধীনতার পক্ষে প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু ২০১৭ সালের সামাজিক ন্যায়বিচার যোদ্ধারা বাক্‌স্বাধীনতার বিপক্ষে প্রতিবাদ করেন। হলফ করে বলতে পারি, এসব দেখলে খোদ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ও ম্যালকন এক্স ব্যথিত হতেন। বর্তমান সামাজিক ন্যায়বিচার যোদ্ধা এবং তাদের নারীবাদী গুরুরা ভিন্নমতকে ঘৃণিত বক্তব্য হিসেবে আখ্যা দেন এবং কঠোরভাবে আক্রমণ করেন। শুধু এ কারণেই বহু লোকের চাকরি গেছে, অন্যায়ভাবে গ্রেফতার আর লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে অনেকে।

নারীবাদ প্রায় সমস্ত পশ্চিমা সরকার এবং আইনিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে মাধ্যমিক কলেজ এবং প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সর্বস্তরে ছড়িয়ে গেছে এই উগ্রবাদী আন্দোলন। ছোটোবেলা থেকেই সমতার শিক্ষা দেওয়ার বদলে এরা শিশুদের অন্তরে ভয়াবহ পুরুষবিদ্বেষ গেঁথে দেয়। জীববিজ্ঞানের মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তনের তত্ত্বটি সম্পূর্ণভাবে রদ করা সত্ত্বেও এখনও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শিশুদের সেসব শেখানো হচ্ছে। ইয়ান মাইলস চেওং ২০১৭ সালের ১৩ এপ্রিল 'Australian Govt Booklet Tells Gender Diverse Teens to Consider Sex Change Surgery' নামে একটি অনুচ্ছেদ লেখেন। চেওং সেখানে বলেন—'অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের সরকার কিশোর-কিশোরীদের হরমোন থেরাপি এবং লিঙ্গ পরিবর্তনমূলক শল্যচিকিৎসার জন্য উৎসাহিত করে—এমন একটি দিকনির্দেশনা সৃষ্টির জন্য অর্থায়ন করেছিল।'

পরের মাসে আমান্ডা প্রেস্টিগিয়াকোমো *Daily Wire*-এর একটি নিবন্ধে প্রতিবেদন করে—

> 'অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ায় প্রায় ৩০০টি বিদ্যালয় নতুন লিঙ্গ পরিবর্তন নীতি নির্দেশিকায় স্বাক্ষর করেছে, যেটা পিতা-মাতার সম্মতি ছাড়াই ছয় বছর বয়সি শিক্ষার্থীদের লিঙ্গ পরিবর্তন করার সুযোগ দেবে।'

আমি যেমনটি বলেছিলাম, শিশুদের রীতিমতো লিঙ্গ পরিবর্তনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এটি এতটাই ভয়াবহ যে, ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে আমেরিকান শিশুবিশেষজ্ঞ কলেজ, স্বাস্থ্যসেবাবিশেষজ্ঞ, শিক্ষক ও আইনজীবীদের শিশুদের লিঙ্গ পরিবর্তন করার রাসায়নিক ও শল্যচিকিৎসার নীতি প্রত্যাখ্যানের আহ্বান জানায়।

জৈবিক বাইনারি বৈশিষ্ট্য XY ও XX হলো নারী-পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারণকারী, তারা কোনো লিঙ্গব্যাধি নির্ধারণকারী নয়। মানব বৈশিষ্ট্য আদর্শকে নারী অথবা পুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয়। মানুষের লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যগতভাবে বাইনারি, যার উদ্দেশ্য প্রজনন ও বিকাশ। এই নীতি স্বতঃস্ফূর্ত। মানুষ জৈবিক লিঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু লিঙ্গ সম্পর্কিত ধারণা তখন কারও থাকে না। লিঙ্গ বা নারী-পুরুষ চেতনা সম্পূর্ণভাবে একটি সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক ধারণা; জৈবিক বস্তুনিষ্ঠ নয়। কেউই পুরুষ কিংবা নারীর অনুভূতি নিয়ে জন্মে না। এই চেতনা সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হয় এবং অন্যান্য বিকাশগত প্রক্রিয়ার মতো এটিও একটি শিশুর মানসিক অবস্থা, পারিবারিক সম্পর্ক এবং শৈশবের বিরূপ অভিজ্ঞতার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। যেসব ব্যক্তি নিজেদের বিপরীত লিঙ্গের কিংবা মাঝামাঝি কোথাও চিহ্নিত করে, তাদের তৃতীয় লিঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। প্রকৃত প্রস্তাবে তারা জৈবিক পুরুষ বা নারীই রয়ে যায়। কোনো পুরুষের নিজেকে নারী মনে করাটা বড়োজোর বিভ্রান্তিকর চিন্তা। এটাকে শারীরিক নয়, মানসিক সমস্যা আকারেই দেখা উচিত।

লৈঙ্গিক সংকট নিয়ে তৈরি হওয়া কৃত্রিম টানাপোড়েন রোধে নানা ধরনের কার্যক্রম যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ছে। এই বেহুদা তৎপরতার অংশ হিসেবে বামপন্থি ও নারীবাদী প্রতারক দল যুগপৎভাবে শিশুদের স্কুলগুলোতে তাদের কুকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। এরচেয়েও আতঙ্কজনক হলো, নারীবাদীদের তৈরিকৃত সামাজিক ন্যায়বিচার আন্দোলন সক্রিয়ভাবে শিশু যৌন নিপীড়নের পক্ষে সমাজের অনুমোদন লাভের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যেটা পেডোফিলিয়া (Pedophilia) হিসেবে পরিচিত।

২০১৫ সালে বামপন্থিরা শিশু ধর্ষণকে স্বাভাবিক হিসেবে দেখানোর জন্য এতই আগ্রহী ছিল যে, তারা স্বস্বীকৃত শিশু যৌন নিপীড়ক টড নিকারসনকে নিবন্ধ প্রকাশের প্ল্যাটফর্ম দিয়েছিল। নিকারসন সেই প্ররোচনামূলক নিবন্ধে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, কেন আপনার শিশু যৌন নিপীড়ন মেনে নেওয়া উচিত। এর বছর দুয়েক পরে শিশু যৌন নিপীড়করা নিজেদের Pedosexual হিসেবে পরিচিত করে এবং সমর্থন লাভের জন্য LBGT+ ট্যাগ পরিবর্তন করে

BGTP+ করার প্রচেষ্টা চালায়। এমনকি টুইটারে তাদের #pedosexual নামে হ্যাশট্যাগও রয়েছে। আরও মারাত্মক ব্যাপার হলো, Heart Progress Foundation নামে শিশু নির্যাতনের পক্ষে একটি সংস্থাও তৈরি করেছিল তারা।

উপরন্তু, ২০১৭ সালের ২৮ মার্চ শিশু নিপীড়ক নিক মার্টিনেজ তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে 'হার্ট প্রোগ্রেস ফাউন্ডেশন : পরমতসহিষ্ণুতার ক্রমবর্ধমান যুগ' নামে একটি ব্লগ পোস্ট লেখে। সেখানে সে বলে—'বামপন্থা গ্রহণ এবং অন্যান্য গ্রুপে যোগদান করার যাত্রায় আমি হার্ট প্রোগেস ফাউন্ডেশন নামের একটি গ্রুপ খুঁজে পেয়েছিলাম। হার্ট প্রোগ্রেস ফাউন্ডেশন নতুন একটি বৈপ্লবিক গ্রুপ, যেটা পেডোসেক্সুয়ালদের সংকটাপন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পেডোসেক্সুয়াল ব্যক্তিদের সমর্থনকারী আর্নস্ট স্টেইনারের উদ্যোগে ২০১৬ সালে গঠিত এই গ্রুপটি অনেক উদ্দীপনা অর্জন করেছে এবং এর সদস্যও প্রতিনিয়ত বাড়ছে। অতীতের সমকামী আন্দোলনের মতো পেডোসেক্সুয়াল আন্দোলনও জনপ্রিয় এবং এর সাম্যের পক্ষে লড়াই করতে আরম্ভ করেছে। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, লাতিন, এশিয়ান, সমকামী, উভয়কামী—যা-ই হই না কেন, আমরা প্রত্যেকেই গ্রহণযোগ্যতা এবং পরমতসহিষ্ণুতা যুগের অংশ।'

আপনি ঠিকই পড়েছেন। এটা শিশু নির্যাতনের পক্ষে গঠিত একটি সক্রিয় গ্রুপ, যেখানে তারা পরস্পর পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। এর আগে ২০১৩ সালের মে মাসে, আমেরিকান মনস্তাত্ত্বিক সংগঠন প্রকাশ্যে পেডোফিলিয়াকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত যৌনপ্রবণতা হিসেবে অভিহিত করে। তাদের ভাষায়—DSM : Diagnositic and Statistical Manual of Mental Disorders। কিন্তু একজন স্বতন্ত্র সাংবাদিক এটা নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করার পর পেডোফাইলদের পক্ষ থেকে এত বেশি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া এসেছিল যে, আমেরিকান মনস্তাত্ত্বিক সংগঠন পিছিয়ে আসে এবং এর সংজ্ঞা পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দেয়। অপমান এড়াতে তারা বলে—'অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।'

নারীবাদী এবং স্বস্বীকৃত পেডোফাইল লিনা ডানহ্যামকে ২০১৬ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আমি কেন ডানহ্যামকে পেডোফাইল বলছি? এর কারণ ডানহ্যাম তার *নট দ্যাট কাইন্ড অব গার্ল* নামক আত্মজীবনীতে নিজের বোনকে যৌন নিপীড়নের জন্য প্রস্তুত করার কথা স্বীকার করেছিল—'সে যখন বড়ো হচ্ছিল, আমি তাকে সময় এবং আদরের জন্য ঘুস দিয়ে প্রভাবিত করতাম।

যদি সে আমাকে মোটরসাইকেলে বসা মেয়েদের মতো মেকআপ করানোর অনুমতি দিত, তাহলে তাকে হাফ ডলার দিতাম। আর ঠোঁটে পাঁচ সেকেন্ড চুমু খেতে পারলে দিতাম তিনটি ক্যান্ডি। আমাকে আরাম দিলে সে টিভিতে যা খুশি দেখার অনুমতি পেত। মূলত যৌন শিকারিরা শহুরে ছোটো একটি মেয়ের সাথে প্রেম করার জন্য যেসব করে থাকে, আমিও তার সাথে সেগুলোই করতাম।'

গ্রন্থের অন্য অংশে সে আরও বলে—'আমি ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত আমার বোনের সাথে এক বিছানায় থাকতাম। সে একা ঘুমোতে ভয় পেত এবং প্রতিদিন বিকেল পাঁচটায় জিজ্ঞাসা করত—আমি তার সাথে থাকতে পারব কি না। তার অনুনয় এবং মুখ ভার করা দেখে আমার ভীষণ আনন্দ হতো। শুরুতে তাকে না করতাম ঠিকই, কিন্তু সব সময়ই শেষ পর্যন্ত নরম হতাম। আমি যখন *অ্যান সেক্সটন* পড়তাম বা *রিটার্নস অব স্যাটারডে নাইট লাইভ* দেখতাম, সে তার উষ্ণ আর্দ্র শরীর আমার পাশে এলিয়ে দিত।'

ডানহ্যামের আত্মজীবনীটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৫ সালের শেষের দিকে। সে হিসেবে সাক্ষাৎকারের আগে ক্লিনটনের জানা উচিত ছিল, ডানহ্যাম একজন স্বস্বীকৃত যৌন নিপীড়ক। কিন্তু আদতে এতে তাদের কিছু যায় আসে না। তবে জাতীয় টিভিতে হিলারি ক্লিনটনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার ক্ষেত্রে একজন যৌন নিপীড়ককে অনুমতি দেওয়ার অর্থ আমার কাছে শিশুদের যৌন নির্যাতকদের উৎসাহিত করা। আপনি কি চান কিছু নারীবাদী অথবা সামাজিক ন্যায়বিচার যোদ্ধারা আপনার সন্তানদের ব্রেইনওয়াশ করুক এটা বলে যে, শিশু যৌন নিপীড়ন এবং লিঙ্গ পরিবর্তনের শিক্ষা যথার্থ?

পশ্চিমা সমাজে এমনভাবে নারীবাদী মতাদর্শ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, এসব হিটলার ইয়ুথ প্রতিষ্ঠাতারাও এসব দেখলে ঈর্ষায় পুড়ে মরত। হিটলারের থার্ড রাইখ টিকেছিল মাত্র দশ বছর। আর নারীবাদের রমরমা রাজ্য এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে চলমান।

সমাধান

বইয়ের এই পর্যায়ে এসে আপনি যদি নারীবাদবিরোধী হয়ে পড়েন, আপনার জন্য রয়েছে মারাত্মক দুঃসংবাদ। নারীবাদ সমস্ত পশ্চিমা সরকার এবং আদালতব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। অসংখ্য নারীবাদী কেবল আইনজীবীই নন, বিচারক হিসেবেও বহু মামলায় সভাপতিত্ব করেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে নারীবাদী নার্স ও মহিলা চিকিৎসকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের অসামান্য নিয়ন্ত্রণ রয়েছে শিক্ষাব্যবস্থাতেও। সুতরাং আমি, আপনি যারাই নারীবাদের প্রতিবাদ করছি, আমরা প্রতিপক্ষ নই; বরং প্রতিবন্ধক।

নারীবাদ হলো স্টার ওয়ার্সের শিথ রাজ্যের মতো। এর ডার্থ সিডিয়াস হলো ফ্লোরা গ্লোরিয়া। তবে আশার কথা, পুরুষেরা নারীবাদীদের ভয়াবহ কুৎসিত প্রকল্পের বিরুদ্ধে জেগে উঠতে শুরু করেছেন। যেসব দেশ নারীবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাদের জন্মহার কমে যাচ্ছে, বিবাহের হারও ক্রমহ্রাসমান। নারীরা অভিযোগ করছে—চটপটে পুরুষেরা তাদের প্রেমিক হওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না, স্বামী তো দূরের কথা। এর কারণ কী? কারণ, পুরুষেরা ক্রমাগত মিথ্যা ধর্ষণ মামলা এবং পারিবারিক সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু হতে হতে ক্লান্ত, অবসন্ন এবং হতাশ। আমি কিন্তু দুর্বল ও নারীঘেঁষা পুরুষদের কথা বলছি না—যারা এখনও নারীবাদের মিথ্যাচার বিশ্বাস করেন। আমি বিশেষভাবে নারীবাদের প্রতি ত্যক্ত ও বিরক্ত পুরুষদের কথা উল্লেখ করছি। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হবে কীভাবে? আমি কেবল কয়েকটি স্বল্পমেয়াদি সমাধান প্রস্তাব করতে পারি।

আমাদের সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে এবং নারীবাদীদের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তবে নারীবাদের বিপক্ষে

অনলাইনে প্রতিবাদ করতে হলে অবশ্যই সেটা বেনামে করতে হবে। অফলাইনে আপনি ছদ্মনামে আপনার নিবন্ধ লিখবেন এবং সচেতন থাকবেন। এটা প্রমাণিত সত্য যে, নারীবাদীরা সুযোগ পেলেই আপনার মতবিরোধকে ঘৃণ্য বক্তব্য হিসেবে দাবি করবে; এমনকি আপনার বিপক্ষে মিথ্যা সহিংসতার মামলা ঠুকে দেওয়া তাদের জন্য মামুলি ব্যাপার। মনে রাখবেন, প্রয়োজনে সমালোচকদের হত্যা করার ব্যাপারেও তারা অতিশয় সুপটু। কারণ, নারীবাদীরা বাতিকগ্রস্তের মতো কাজ করে। তাদের ভয় প্রদর্শনকে কখনোই হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। মনে জোর না থাকলে যতদূর সম্ভব নারীবাদীদের এড়িয়ে চলুন। তাদের সাহায্য করবেন না। আর বন্ধুত্বের তো প্রশ্নই ওঠে না। কোনোক্রমেই তাদের সাথে নিজেকে জড়াবেন না। একজন পুরুষ হিসেবে এটা আপনার জন্য আত্মরক্ষা। কারণ, ধর্ষণ কিংবা পারিবারিক সহিংসতার একটি মিথ্যা মামলা আপনার গোটা জীবন ধ্বংসের মুখে ফেলে দিতে পারে।

তাই বলে সব নারীই আপনার বিরুদ্ধে ধর্ষণ বা পারিবারিক সহিংসতার মিথ্যা অভিযোগ আনবে—এমন নয়; কিন্তু প্রতিটি নারীই তা করতে সক্ষম। এ ছাড়াও এই একই উপদেশ নারীবাদী পুরুষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তারা নারীবাদীদের চেয়ে দ্রুতগতিতে আপনাকে ছুরিকাঘাত করবে। নারীবাদ বিরোধীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলুন, অফলাইন-অনলাইন যেখানেই হোক না কেন। আমি গত নির্বাচনে যেমন ট্রাম্পকে ভোট দিইনি, তেমন হিলারিকেও দিইনি। সত্যি বলতে, কমপক্ষে ৫০% প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকান ভোটার ২০১৬ সালের নির্বাচনে ভোট দেয়নি। আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ নই, যেমনটা নারীবাদীরা দাবি করে; বরং আমরা নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠ।

আমরা একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত থেকে নিজস্ব সামাজিক নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করছি। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, আমরা সবাইকে তথ্য জানাচ্ছি, শিক্ষা প্রদান করছি, শিখছি এবং একে অপরকে সহযোগিতা করছি। এটি সরকার ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীবাদী আইন ও নীতি বিনষ্ট করতে আমাদের অনন্য অবস্থানে নিয়ে যাবে। নারীবাদীদের 'বিরোধী নির্মূল প্রকল্প' থেকে বিরত রাখার জন্য আমাদের কাজ করা জরুরি। যখনই কোনো উচ্ছৃঙ্খল নারীবাদীর সাথে আপনার দেখা হবে, তাদের সামনে সত্য তুলে ধরুন।

মনে রাখবেন, সামনাসামনি অপবাদ দেওয়াটা অধিকাংশ সময় ফলপ্রসূ। এটি একটি টেকসই উপায়। সুতরাং এই পদ্ধতি ব্যবহার করুন। আর যারা প্রকাশ্যে নারীবাদের বিরোধিতা করতে পারে না, কেবল তারাই মিম ও ট্রোল যুদ্ধে

অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন অনলাইন ফোরামে নারীবাদীদের কেন্দ্র করে ব্যঙ্গ, ট্রল ও আক্রমণাত্মক কৌতুকের মাধ্যমে তারা নিজেদের নির্বোধ প্রমাণ করে মত। নারীবাদের বিপক্ষে কার্যত তাদের প্রতিরোধ প্রায় শূন্য। এ রকম মিম যুদ্ধের একজন বড়ো তারকা হলেন জেডি অর্ডার। তারা অনলাইন ফোরামে নারীবাদী এবং তাদের সমর্থনকারীদের উপহাস করার জন্য ভুয়া প্রচারণা চালাচ্ছেন। এর উদাহরণ হলো—বিখ্যাত *ফ্রি ব্লিডিং* আন্দোলন। অতি সরল কোনো নারীবাদীকে তার পিরিয়ডের সময় তুলার পট্টি বা প্যাড ব্যবহার থেকে বিরত রাখা যায় কি না, সেটা দেখার জন্য পল একটি পরিকল্পনা করে।

তারা হাস্যরসাত্মকভাবে দাবি করে, পিরিয়ডের সময় কাপড়ের রক্ত সবাইকে দেখানোটা নারীবাদী সক্রিয়তা ও ক্ষমতায়নের বহিঃপ্রকাশ। কাণ্ডজ্ঞানহীন নারীবাদীরা সত্যি সত্যি সেই ফাঁদে পা দেয়। মাসিকের রক্তের দাগযুক্ত পোশাক প্রদর্শনের মাধ্যমে তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের লাঞ্ছিত করে। ইন্টারনেটজুড়ে সেসব ছবি ব্যাপক প্রচারণা পায়। কিছু নারীবাদীরা এতটাই নির্বোধ আর উগ্র ছিল যে, তারা পুরো মুখে নিজেদের দূষিত রক্তের দাগ লেপে দেয়। যদিও পল এই আন্দোলন শুরু করেছিল নেহায়েত বিনোদনের জন্য, নারীবাদীরা এখনও তা সত্য বলেই বিশ্বাস করে।

এরপর Piss for Equality প্রচারাভিযান শুরু করে পল। এ পর্যায়ে তারা নারীবাদীদের বিশ্বাস করাতে পেরেছিল, উদ্দেশ্যমূলকভাবে অসংযমী হওয়া নারীবাদী ক্ষমতায়ন ও সক্রিয়তার আরেকটি রূপ। পল ও তার সহযোগীরা এর প্রচার শুরু করতেই প্রস্রাবপূর্ণ কাপড় পরিধান করা নারীবাদীদের ছবিতে ভরে গিয়েছিল টুইটার, ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। এরপর Pepe the Frog আন্দোলনের সূচনা হয়।

বলা হয়ে থাকে, এটাই ছিল পলের সব থেকে সেরা কাজ। তারা বলে পিপি একটি বর্ণবাদী চিহ্ন। সকলে সেটা বিশ্বাসও করে। এই ভুয়া বিষয়কে সত্য ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রিপোর্ট করে একদল বিশ্লেষক। এমনকি সাদা আধিপত্যবাদীরাও এই ধারণা গ্রহণ করে। এরপর পল প্রচলন করে, OK হাতের চিহ্নটি এখন সাদা শক্তিধরদের প্রতীক। সামাজিক ন্যায়বিচার যোদ্ধারা তখন উন্মাদ হয়ে যায় এবং গণহারে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো—নারীবাদী এবং সামাজিক ন্যায়বিচার যোদ্ধারা যত বেশি পল জেডির বিপক্ষে লড়াই করে, তাদের তত বেশি খারাপ দেখায়। এক্ষেত্রে পলের প্রশংসা না করে উপায় নেই।

এগুলো হলো সম্ভাব্য স্বল্পমেয়াদি সমাধান। তাহলে দীর্ঘমেয়াদি কোনগুলো?

যদি আপনি পুরুষ হয়ে থাকেন এবং ভোট প্রদান না করেন, তাহলে ভোট দেওয়া শুরু করুন। প্রতিটি নির্বাচনে ভোট দিন। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে এটা আমাদের অন্যতম শক্তিশালী একটি অধিকার। যদি আপনি ভোট না দিয়ে থাকেন, আপনি এর অপচয় করছেন। সুতরাং নারীবাদী বা এর সমর্থনকারী যেকোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোট দিন। নারীবাদীরা তাদের তহবিলের একটি বিশাল অংশ সরকারি অনুদান হিসেবে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের নিকট থেকে পেয়ে থাকে। আপনারা সবাই ভোট দিলে সরকারের নারীবাদী অর্থায়ন বন্ধ করা সম্ভব।

এ ছাড়াও পারিবারিক মূল্যবোধ সমর্থন করুন। যদিও আপনি এটি তাৎক্ষণিক করতে পারেন, তবে আপনার এটা দীর্ঘমেয়াদে করা উচিত। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি সমাধান এবং অবাধ যৌনাচার আন্দোলনের সমস্যা ও পরিণতি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সর্বোপরি, আপনার সমমনা মানুষদের সাথে কথা বলুন। আপনার জ্ঞান, বিজয় ও ব্যর্থতার কথা শেয়ার করুন। দীর্ঘমেয়াদে জনসাধারণের সাথে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত থাকার মাধ্যমে আমরা নিশ্চয়ই একদিন নারীবাদের মিথ্যাচারগুলো কাটিয়ে উঠতে পারব।

০
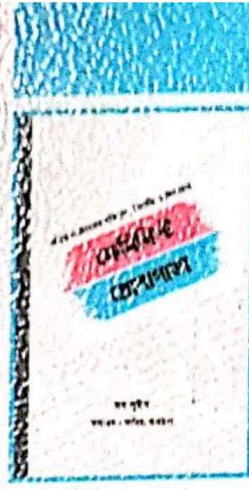
নারীবাদীরা ফিতরাতের বাইরে নারী-পুরুষ সমতার পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে একটা পর্যায়ে নারীকে স্রেফ ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করে। এজন্য যেই পশ্চিমা সমাজে নারী অধিকার ও নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে এত মাতামাতি, খোদ সেখানেই নারীবাদীদের কুরুচিপূর্ণ যৌনাচার, বর্ণবাদ, পুরুষনিগ্রহ এবং ক্ষমতার বিকার সভ্যতা ও নৈতিকতার যাবতীয় মাত্রা ছাপিয়ে গেছে। কিন্তু দুনিয়াব্যাপী নারীবাদীদের সেইসব অব্যাহত অপকর্মের কতটুকু আপনি জানেন? নারীবাদ কি আসলেই নারী-পুরুষ সমতার কথা বলে? নাকি সমতার ছদ্মাবরণে নারীকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলাই তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য? সমাজ, রাষ্ট্র ও টিভি-মিডিয়ার সর্বত্র কীভাবে তারা ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে ওত পেতে বসে আছে—এসব রহস্য উন্মোচন করে এই বইটি আপনাকে নারীবাদীদের প্রবঞ্চনা, অর্থলালসা, পুরুষবিদ্বেষ ও হন্তারক মনোবৃত্তির দুর্লভ সব খবর সরবরাহ করবে; আপনাকে করে তুলবে নারীবাদী সম্পর্কে আরও বেশি সজাগ ও সমঝদার।